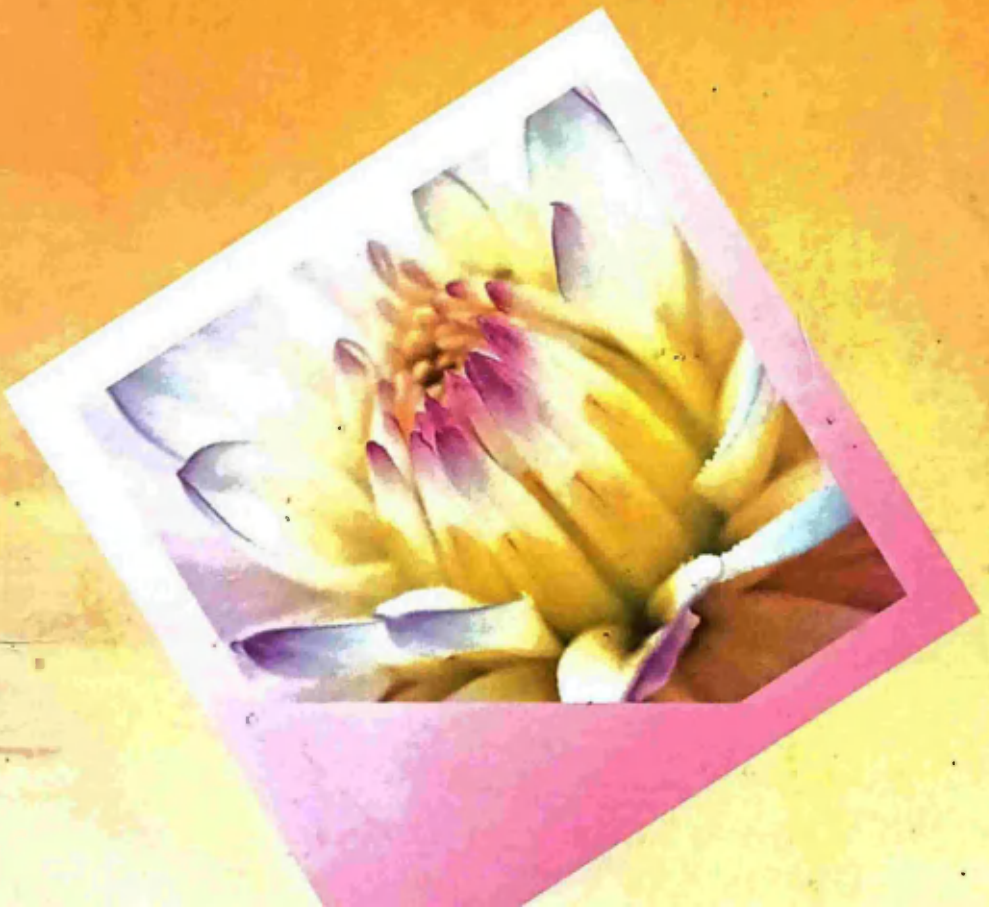
যৌবন ও দাম্পত্য জীবনে ইসলাম

মাওলানা কারী আফযাল হুসাইন রাহমানী



যৌবন ও
দাম্পত্য জীবনে
ইসলাম

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

যৌবন ও দাম্পত্য জীবনে ইসলাম

মাওলানা কারী আফযাল হুসাইন রাহ্‌মানী
শিক্ষা সচিব ও মুহাদ্দিস. চরগলগলিয়া মাজহারুল উলুম ইসলামিয়া
মাদরাসা, আবদুল্লাহপুর, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭২৬৩৫৮৩৭০

বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৮১৭০৮৭৬৩৪



যৌবন ও দাম্পত্য জীবনে ইসলাম
মাওলানা আফযাল হুসাইন রাহ্‌মানী

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১০ ঈ.

প্রচ্ছদ
নাজমুস সায়াদ

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৬০ টাকা

ISBN : 984-70168-0025-2

Jowbon O Dampotta Jibone Islam : Mawlana Kari Afzal Hossion Rahmani, **Published by :** S M Aminul Islam, **BhoiGhor** : 43 Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 **First Edition :** December 2010 © by the pablisher

Price : 60 Taka only

উৎসর্গ

মরহুম শ্রদ্ধেয় দাদা-দাদী ও নানা-নানীর রুহের মাগফিরাত কামনায় উৎসর্গ করলাম। যাদের ঐকান্তিক প্রেরণা ও দোয়া আমার জীবনে লেখাপড়ার উৎসাহ যুগিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে তাঁর অপরিসীম ফযল ও রহমতের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিন এবং তাদের কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন। আমীন!

আফযাল হুসাইন রাহমানী

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, বহুল পঠিত ও প্রাচীনতম ইসলামী পত্রিকা মাসিক মদীনার সম্পাদক হযরত মাওলানা **মুহিউদ্দীন খান**-এর

অভিমত

তথ্য-প্রযুক্তির বর্তমান সময়ে চারদিকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অশ্লীলতার জোয়ার বইতে শুরু করেছে। এতে আক্রান্ত হচ্ছে যুব-সমাজ। প্রকৃত আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তারুণ্য। দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য এটা কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনছে তা ভেবে আমাদের পেরেশানির অন্ত নেই। অথচ ইসলাম মানুষের যৌবনকালকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। যৌবনকাল এবং বিবাহ-পরবর্তী দাম্পত্য জীবন কীভাবে অতিবাহিত করতে হবে তার সুস্পষ্ট বিধানাবলী রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত দীন তথা ইসলামে। এর আলোকেই স্নেহভাজন মাওলানা আফযাল হুসাইন রাহমানী লিখেছেন যৌবন ও দাম্পত্য জীবনে ইসলাম গ্রন্থটি। বইটির পাণ্ডুলিপিতে চোখ বুলানোর সুযোগ হয়েছে আমার। দেখে মনে হচ্ছে এর মাধ্যমে পাঠকবর্গ যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

বাংলা ভাষায় যে কোন একটি ইসলামী বই আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। যাঁদের আল্লাহ পাক এই মহৎ কাজে নিয়োজিত করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে দীনের এক একজন মুজাহিদ। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা তরুণ এ আলেমকে আরও বেশি বেশি দীনের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিক দিন। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

তারিখ : ২৯/১১/১০

মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক. মাসিক মদীনা, ঢাকা।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া রসূলপুর আবদুল্লাহপুর, ঢাকা-এর প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস আল্লামা ইরফান বিন তোরাব আলী সাহেব-এর

অভিমত

এই বিশাল পৃথিবীর অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ যাতে করে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রেখে সুশৃঙ্খল আদর্শ জীবন গড়ার মাধ্যমে সৃষ্টিগত উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়, যে উদ্দেশ্যে স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে নিখুঁত বিধি-বিধান প্রদত্ত হয়েছে। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এই বিধি-বিধানকেই ইসলাম নামে অভিহিত করা হয়েছে। একটি পরিপূর্ণ বিধি-বিধান হিসেবে ইসলামের করণীয় বর্জনীয় বিষয়গুলো জানা আবশ্যক। কারণ ইসলাম বিদ্বেষীদের নানা অপকৌশল মুসলমানদের মাঝে স্বীয় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুসলমান গোমরাহী বরং ধর্মহীনতার ছোবলে আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। হচ্ছে লাঞ্ছিত বঞ্চিত এবং চরম অপদস্থ। কিন্তু ইসলাম তার স্বীয় অস্তিত্ব নিয়ে সুদৃঢ়ভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। এর মূল কারণ হলো আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং ইসলামকে হেফাযতের প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলনে ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ মনীষীগণ সর্বযুগেই তাজদীদ তথা পরিশুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত বিষয়াদিকে সুসংরক্ষণের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। কেবল বয়ান, বিবৃতি ও প্রতিবাদের মাধ্যমেই নয়; বরং রচনা ও লেখার মাধ্যমেও তারা সর্বযুগে অব্যাহত অবদান রেখেছেন। আমি আমার স্নেহভাজন মাওলানা আফযাল হুসাইন রাহমানী রচিত 'যৌবন ও দাম্পত্য জীবনে ইসলাম' শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি ইসলামে যৌবনকালে ও দাম্পত্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর ইসলামী রীতিনীতির বিবরণ প্রদান ও

এসবের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে বাঁচার উপায় আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের সুসংরক্ষণের সেই দায়িত্ব পালনে অব্যাহত ধারায় নিজেকে সংযুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে তাকে উৎসাহিত তথা সার্বিক সহযোগিতা করা একান্ত আবশ্যক। যদিও এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় যথেষ্ট কিতাবাদি রয়েছে। এমনকি বাংলা ভাষায়ও অনেক পুস্তক পুস্তিকা রয়েছে। তবুও আমার বিশ্বাস, এ গ্রন্থখানি এ বিষয়ে অন্যতম হিসেবে সর্বস্তরের ধর্মপ্রিয় মানুষের হৃদয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হবে। আমি লেখকের জন্য আন্তরিক দোয়া এবং গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

আরজগুজার

তারিখ : ১৫/১১/১০ এইচ এম এম ইরফান বিন তোরাব আলী
প্রিন্সিপাল. জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া রসূলপুর।

https://t.me/islaMic_fdf

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা মহিয়ান গরীয়ান সর্বশক্তিমান আল্লাহর যিনি সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্বজাহান। দরূদ ও সালাম সেই সে নবীর উপর যাঁকে ঘিরে সৃষ্ট এ জাহান। যিনি দয়ার আকর রহমতের নহর, যাঁকে ছাড়া এ পৃথিবী থাকত অন্ধকারের অতল গহ্বরে। একই সাথে তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ, অনুসারীগণ ও পরিবার পরিজনের উপর সালাম।

মুহতারাম পাঠক/পাঠিকাবৃন্দ! কালের চিরন্তন গতিধারায় বর্তমান সময়টা মুসলিম মিল্লাতের জন্য অত্যন্ত কঠিন। মুসলমানগণ ইসলামের সুমহান আদর্শ রীতিনীতি ছেড়ে দিয়ে ইসলাম-বিদ্বেষী চিন্তা-চেতনা, রীতিনীতি লালন করতে শুরু করেছে। আর এরূপ ইসলাম বিধ্বংসী কার্যকলাপ বর্তমান নোংরা মিডিয়া, চলচ্চিত্র, অশ্লীল ম্যাগাজিন, গল্প-উপন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে অবাধে চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমাজের যুবক-যুবতীরা। আমি দীর্ঘদিন যাবত এ বিষয়টি মাথায় রেখে যুব সমাজকে ইসলামী আদর্শ ও রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট করতে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনার প্রয়াস চালাই। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অশেষ রহমতে আজ সেটি আলোর মুখ দেখছে।

আমার লেখায় যৌবন ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মাসাইল ও শরয়ী নীতিমালা কুরআন ও হাদীসের আলোকে সংযোজন করতে সচেষ্ট থেকেছি। বিশেষ করে **تخبة الولدوالوالد** ও **هدية الناء** ইত্যাদি গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর অনুসরণ করেছি। আশা করি এ গ্রন্থটি যুব সমাজকে ইসলামী জীবন যাপনের পথে চালিত করতে সহায়ক হবে। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সুধী পাঠক/পাঠিকার উপকারে আসলেই কেবল আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। মহান আল্লাহ তাআলা আমার অকিঞ্চিৎকর খেদমতটি কবুল করুন এবং আখেরাতে এটিকে আমার নাজাতের উসিলা করে দিন। আমীন!

আহকার

তারিখ : ০৮/১১/১০ মুহা. আফযাল হুসাইন রাহমানী

সূ চি প ত্র

যৌবনের সূচনা / ১৫
যৌবনের ক্রিয়া-কলাপ / ১৬
যৌবনের সহীহ হেফাযত / ১৬
যৌবনের হেফাযত কিভাবে করবে / ১৭
অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কারের সময়সীমা / ১৮
সংশোধনের পথ ও পদ্ধতি / ১৯
বিয়ে কখন করা উচিত / ১৯
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আদব / ২০
বিয়ের আদব / ২৫
কনে উঠিয়ে দেওয়ার ইসলামী রীতি / ২৮
ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব / ২৯
বিবাহের ফজিলত / ২৯
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইসলামী বিবাহ-বিধি / ৩০
বৈধ মিলনের উপকারিতা / ৩১
নববধূর জন্য জরুরি উপদেশ / ৩২
বাসর-রাত্রি কীভাবে অতিবাহিত করবেন / ৩৪
সহবাসের আদব / ৩৭
সহবাসের সময়সীমা / ৪২
সহবাসের সঠিক সময় / ৪৪
সহবাসের পদ্ধতি / ৪৪
ফরয গোসলের বর্ণনা / ৪৬
যিনার বিবরণ / ৪৭
ওলীমার বর্ণনা / ৪৭

স্বামী-স্ত্রীর হক / ৪৮
স্বামীর উপর স্ত্রীর হক / ৪৯
শরয়ী হকসমূহ / ৪৯
চারিত্রিক হকসমূহ / ৫০
নারীর সংশোধনের পদ্ধতি / ৫১
স্ত্রীর উপর স্বামীর হকসমূহ / ৫৫
গর্ভ সম্পর্কিত কয়েকটি কথা / ৫৬
প্রসবকালীন অবস্থার বিবরণ / ৫৯
সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা / ৬০
সন্তানের নিকট মাতা-পিতার হকসমূহ / ৬১
বনি ইসরাইলের তিন লোকের কাহিনী / ৬১
হযরত মুসা (আ.)-এর জান্নাতের সাথী / ৬২
মৃত্যুকালে কালিমা নসীব না হওয়া / ৬৩
একজন দীনদার নারীই পারে একটা
পরিবারকে বদলে দিতে / ৬৩

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম/ কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) [১-১০ খণ্ড]
- ইসলাম ও বিজ্ঞান/ হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্ম তৈয়ব (রহ.)
- নামাযের কিতাব/ হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)
- ক্ষণস্থায়ী রঙিন দুনিয়া/ জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী
- সাহসের গল্প/ মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
- কুরআন আপনাকে কী বলে/ প্রফেসর আহমদ উদ্দিন মাহবারবী
- মোবাইল ফোনের শরয়ী আহকাম/ মুফতী আবদুল আহাদ
- বাংলা ভাষা ও বানানরীতি/ এম এ মোতালিব
- নোলক/ সমর ইসলাম
- স্বপ্নের উপাদান/ সমর ইসলাম
- দীনী দাওয়াত ও আল্লাহর মদদ/ মাওলানা তারিক জামীল
- কালের আয়নায় মুসলিমবিশ্ব/ শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)
- গল্পের ফুলদানী/ হাফেয মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন
- কালিলা দিমনার গল্প/ হাফেয মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন
- ঈদুল আজহা ও কুরবানী/ মুফতী মাওলানা মো. আবুল কালাম
- বাঙালি মুসলমানের দারিদ্র্যের সন্ধানে/ মো. শওকত আকবর
- জ্ঞানী-গুণীদের ভাবনায় নারী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ / মো. শওকত আকবর
- ইতিহাসের গল্প-১ : ভারত শাসন করলো যারা/ মো. জেহাদ উদ্দিন
- আলোর পথে/ খালিদ বিন অলিদ
- আকাশ ঝরা বৃষ্টি/ এম এ মোতালিব
- পথহারা শিশুর আর্তনাদ/ কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ
- আদর্শ যুবক-যুবতী-২/ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম
- হৃদয়ের রক্তক্ষরণ/ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম
- কষ্টের ছিটমহল/ আনোয়ারুল কাইয়ুম কাজল



যৌবনের সূচনা

ছেলেদের যৌবন শরীয়তের দৃষ্টিতে বিভিন্ন আলামত দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। স্বপ্নদোষ হওয়া অথবা তার দ্বারা কোন মহিলার গর্ভ সঞ্চার হওয়া এবং উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হওয়া। কিন্তু যদি এরূপ কোন আলামত বালেগ হওয়ার পরও প্রকাশ না পায়, তাহলে পনের বছর পূর্ণ হলে পর শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ হিসাবে গণ্য হয়। মেয়েদের বালেগ হওয়ার আলামত হায়েয হওয়া অথবা স্বপ্নদোষ হওয়া বা গর্ভধারিত হওয়া কিংবা উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হওয়া। আর যদি কোন আলামত প্রকাশ না পায় তাহলে পনের বছরে পা রাখলে বালেগা হিসাবে পরিগণিত হবে। বালেগ হয়ে যাওয়ার পর ছেলে মেয়ে প্রত্যেকে শরীয়তের আহকামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। নামায, রোযা এবং অন্যান্য বিধি-বিধান তার উপর ফরয হয়ে যায়। এখন যদি অমনোযোগিতা অথবা অজ্ঞতার ফলে তা আদায় না করে তাহলে তার কাযা এবং তার প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। বালেগ হওয়ার পূর্বে বাচ্চা তার মাতা-পিতার অনুগত ছিল। শরীয়তের দিক থেকে তার উপর কোন বিষয় ফরয ছিল না। কিন্তু যখন সে বালেগ হয়ে গেল, তখন সে পূর্ণাঙ্গ একজন পুরুষ বা নারী হিসেবে গণ্য হবে এবং শরীয়তের সকল বিধি-বিধান তার উপর অর্পিত হবে।

যৌবনের ক্রিয়া-কলাপ

আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে–

الشباب شعبة من الجنون

অর্থাৎ যৌবন পাগলামীর একটি অংশ এবং তার হাকীকত হল এই যে, বাচ্চা যৌবনে পা রাখার পর হতেই বিভিন্ন রকম জযবা অথবা বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ শুরু করতে থাকে। আর এদিক সেদিকের সোসাইটি, সহপাঠীদের সঙ্গে আনাগোনার সূত্রপাত শুরু হয়ে যায়। নওজোয়ান ছেলেদের জন্য এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক।

যৌবনের সহীহ্ হেফাযত

মা-বাবার জন্য উচিত, সন্তান উপযুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। ভুল পথের সাথীদের এবং বন্ধুদের থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা। এভাবে সিনেমা, থিয়েটার, নাট্যমঞ্চ, গানের আসর উলঙ্গ ছবি প্রদর্শন তথা চারিত্রিক ক্ষতিকারক বিষয়গুলো থেকে পুরোপুরি বাঁচানো। এমনকি মহিলাদের মন্দ খপ্পর এবং তাদের মজলিসে আসা যাওয়া এবং যুবতী মেয়েদের সাথে মেলামেশা থেকে দূরে রাখা। নওজোয়ানের পাশাপাশি নিজেও এ সকল কথাবার্তা থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় যৌবনের প্রথম থেকেই উচ্ছৃংখল হয়ে পড়বে। অতঃপর তাকে পরিশুদ্ধ করা পাহাড় থেকেও ভারী হয়ে যাবে। আর সম্মান বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বিশুদ্ধতার মানসিকতাও হারিয়ে ফেলার কঠিন ভয় রয়েছে। এটা এমন একটি বিষয় যা একবার নষ্ট হয়ে গেলে ভবিষ্যত জিন্দেগিকে বরবাদ করে দেয়। এজন্য মানুষের জন্মগত দুটি চাহিদা থাকে– এক. মনের চাহিদা এবং দুই. প্রেম ভালোবাসা ও মনুষত্ব। আর যৌবনের সূচনা থেকেই এ দুটি জিনিসের পালে হাওয়া লেগে যায়। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বর্জনের জন্য বলা হয়েছে। এগুলোর দ্বারা এ দু'টি বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ এসে যায়। অতঃপর বিবেকও সেখানে লোপ পেতে থাকে। এক্ষেত্রে অনেক সময় কোন ভুল স্থানের উপর এশক ও মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপনের পর স্বীয় চাহিদা পূর্ণ করার চেষ্টা

চলতে থাকে। ফলে মন্দ কাজের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। আর যদি কোন ভুল পথে পরিচালিত নফস কাঙ্ক্ষিত বস্তু না পায়, তাহলে নিজের মনের চাহিদা পূর্ণ করার জন্য ভুল এবং অভ্যাসের বিপরীত বিষয়ও অনুসন্ধান করে থাকে। ছেলেদের সাথে কুকর্ম করা, হস্তমৈথুন এবং এরূপ খারাপ অভ্যাসে লিপ্ত হয়ে দীন আর দুনিয়া উভয়টি নষ্ট করবে। পরিশুদ্ধতা খতম হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে অনেকেই ভবিষ্যতে বিবাহেরও অনুপযুক্ত হয়ে যায় আর ধীরে ধীরে মরা ফুলের ন্যায় পুরুষত্বহীন হয়ে যায়। এ ধরনের বদঅভ্যাসের ফলে অনেক সময় ধ্বজভঙ্গ, সান্নিক-এর মত ধ্বংসশীল রোগের জন্ম হয়, যার চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন। তাই পনের বছর বয়স থেকে বিশ-বাইশ বছর পর্যন্ত তাকে চূড়ান্ত পবিত্রতা এবং ভাল চরিত্রের জন্য সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। সৎকর্মশীল লোকদের সঙ্গে চলাফেরা ওঠাবসা করাবে। এই সময়ের মধ্যে যদি সে স্বীয় বিশুদ্ধতা ও যৌবনের হেফাযত করতে পারে তাহলে পুরো জীবন নেক এবং আনন্দের সাথে যাপন করবে। আর যদি এ সময় খারাপ লোকের সাথে ওঠাবসা ও মন্দ আচরণ করে তাহলে আশঙ্কা থেকে যায় যে, তার মৃত্যু ও জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে।

যৌবনের হেফাযত কিভাবে করবে

১. বাচ্চারা যখন উপযুক্ত এবং বুদ্ধিমান হয়ে যাবে (যার বয়স অনুমান সাত বছর হবে) তখন তাকে পৃথক বিছানায় ঘুমানোর অভ্যাস করতে হবে। হোক সে মাহরাম অর্থাৎ ভাই-বোনই। তবুও একসঙ্গে ঘুমানো শরীয়ত নিষেধ করেছে। এতে করে তাদের মধ্যে কখনও চারিত্রিক স্খলন হয়ে যেতে পারে। আর গায়রে মাহরামদের সাথে সংশ্রবের ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

২. কেবল বুঝদার হয়েছে এমন সন্তানদের জন্য একেবারে নির্জনে বা শূন্যতার মধ্যে থাকা এবং ঘুমানোও ভালো নয়। কেননা, তার অন্তরে দুশ্চিন্তার উদ্রেক হতে পারে যা ভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সকলের পৃথক পৃথক বিছানায় ঘুমানো উচিত।

৩. যৌবনের শুরুতে শরীরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিশেষ করে বিশেষ অঙ্গের পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত প্রয়োজন। নতুবা ময়লা আবর্জনা জমে চুলকানি

বা চর্মরোগের সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি চুলকানোর দ্বারা যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে ক্ষতিকারক চিহ্ন প্রকাশ পেতে পারে। নাভীর নিচের লোমও পরিষ্কার করে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কারের সময়সীমা

উত্তম হলো এই যে, প্রত্যেক সপ্তাহ বিশেষ করে জুমআর দিন পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। অর্থাৎ নখ, গোঁফ কাটা এবং নাভীর নিচের লোম এবং বগলের নিচের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করার পর গোসল করা। বগলের লোম প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার না করা গেলে পনের বিশ দিনের মধ্যে করে নিবে। এর সর্বশেষ সীমা চল্লিশ দিন পর্যন্ত। যদি চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, আর কেউ তা পরিষ্কার না করে তা হলে গুনাহগার হবে।

এক হাদীসে এসেছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক জুমআর দিন নখ এবং গোঁফ কাটতেন। প্রতি বিশ দিন পর নাভীর নিচের লোম এবং চল্লিশ দিন অন্তর বগলের নিচের লোম পরিষ্কার করতেন। নাভীর নিচের লোম উপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা পরিষ্কার করতেন। *[ফতোয়ায়ে রহিমিয়া : ২য় খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা]*

৪. যুবক ছেলেদেরকে কোনও একটি ভাল কাজে লিপ্ত রাখা প্রয়োজন। বেকার রাখা অত্যন্ত মন্দ ব্যাপার। এক জ্ঞানীর কথা– তিনি বলেন, বেকারত্ব মন্দ কাজের মূল, তা থেকে অনেক মন্দ কাজের সৃষ্টি হয়।

৫. খারাপ বন্ধু, খারাপ সাথী এবং মন্দ লোকের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা একান্ত প্রয়োজন। খারাপ লোকের সংশ্রবে অনেক ভালো মানুষও খারাপ হয়ে যায়। আর নওজোয়ানের ক্ষেত্রে তো তা আরও ভয়ানক।

৬. খারাপ প্রবন্ধ, কাব্য, উপন্যাস, কবিতা, প্রেম কাহিনী, প্রেমের চিঠি ইত্যাদি পড়া যা মানুষের চাহিদাকে বিনষ্ট করে ভুল পথের দিকে নিয়ে যায়– তা থেকেও বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

৭. এভাবে সিনেমা, থিয়েটার অশ্লীল ছবি প্রদর্শন, গান গাওয়া, বাজানো, যুবতী নারীর দিকে তাকানো, মন্দভাব প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ সকল বিষয় অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এ থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ করে যুবকদের বেঁচে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৮. যদি ঘরের মধ্যে চাকর, কাজের মেয়ে এবং শ্রমিক প্রমুখ আসা-যাওয়া করে, তাহলে ঘরের উপযুক্ত ছেলে মেয়েদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। অন্যথায় অনেক সময় হাসি ঠাট্টার মধ্যেও ধ্বংস এসে যায়।

৯. মা-বাবার উচিত, সন্তানের ভালাই এবং সংশোধন ও কামিয়াবীর জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট দুআ করা।

১০. ভালো লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে এবং ভালো লোকদের সংস্পর্শে ওঠাবসা এবং ভালো দীনি সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহ দেয়া।

সংশোধনের পথ ও পদ্ধতি

সন্তানের যৌবন তথা শারীরিক সুস্থতার জন্য বড় দায়িত্ব বর্তায় মাতা-পিতার ও পরিবারের বড়দের উপর। তাদের উচিত, যুবক ছেলে-মেয়েদের প্রতি সর্বাবস্থায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। অত্যন্ত কৌশলে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদেরকে কুসংস্কার থেকে বাঁচিয়ে রাখা। তাদের চলার গতি এবং বয়সের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভালো গল্প কাহিনী বর্ণনা করবে। বিপুল সাহস উচ্চ মর্যাদা এবং সর্বদা ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে তার মনকে সৎ রাখবে অথবা নিজে কোন ভালো কাজ করবে ও ভালো সভা-সেমিনারে যাবে, ভালো লোকদের সাথে সাক্ষাত করবে। এক্ষেত্রে বাচ্চাদেরও সাথে রাখবে। কেননা এর বরকত তারও অর্জন হল আর বাল্যকাল থেকেই এসবের প্রতি বাচ্চারও উৎসাহ বাড়বে এবং এর অভ্যাস সৃষ্টি হবে।

বিয়ে কখন করা উচিত

যুবক হওয়ার পর যদি বিয়ের ইচ্ছে হয় এবং এর প্রতি ঝুঁকতে থাকে তবে বিয়ে করে নেয়া যায়। তবে একেবারে যৌবনের শুরুতেই বিয়ে করে ফেলা সুস্থতার জন্য ক্ষতিকারক। এ জন্য যে, এই বয়সে শারীরিক অঙ্গগুলো বাড়তে থাকে আর অঙ্গসমূহের মজবুতি ও পূর্ণাঙ্গতা সৃষ্টি হয়। যদি এমতাবস্থায় বিয়ে হয় তাহলে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গই নিস্তেজ হতে শুরু করে এবং এটা স্বীয় অজ্ঞতা ও মনের চাহিদা কাবু না থাকার কারণে বুঝে আসে না। যার ফলে শরীরের প্রধান অঙ্গগুলো ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে।

❖ এটা এজন্য যে, মানুষের খাদ্য দীর্ঘদিন অতিক্রম করে বীর্য তৈরি হয়। যার মধ্যে সৃষ্টিকর্তা মানুষ তৈরির শক্তি দিয়েছেন। এখন যদি এত মূল্যবান বস্তু (বীর্য) জ্ঞান-বুদ্ধির ঘাটতির কারণে শুক্রগুলো দুর্বলতার সাথে ক্ষয় হওয়া শুরু হয়, তখন সমস্ত বীর্য সম্পূরক বস্তুর চাহিদার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং রক্ত থেকে তৈরিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে যাবে।

❖ এমন নওজোয়ানকে তার সুস্থতা ও সবলতার রক্ষণা-বেক্ষণ করা উচিত। অবৈধ পন্থায় (পুরুষত্বকে) নষ্ট না করা উচিত। তারপর যখন কিছুদিন যাবার পর স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তাতে অত্যন্ত তৃপ্তি ও সান্ত্বনাময় ও আরামদায়ক হবে। যার প্রতিদান বুঝা সম্ভব নয়।

❖ এখন যদি যৌবনে পা দিতেই কোথাও সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যায়, তবে তা ভাল। কেননা মহব্বত এবং যৌবনিক চাহিদার জন্য এটা একটা প্রশান্তির কারণ। ভাবনাময় পৃথিবীর এদিক সেদিকে তাকানো এবং অন্যদের কাছে আসা যাওয়া প্রভৃতি থেকে বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বিয়ের পূর্বে সে পরনারীই (বেগানা) থাকবে। বিয়ের পূর্বে তার শরীরে হাত লাগানো, তার সঙ্গে কথা বলা, তাকে দেখা নাজায়েয, হারাম।

সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আদব

ছেলে যুবক হওয়ার পর যখন সে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, তখন উত্তম হল– আগে প্রতিপক্ষের সম্মতি জানা। যদি সে নিজে কিছু না বলে তখন তার সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে তার মনের আগ্রহের কথা জানা। যদি তার মনের আগ্রহের কথা কোন প্রকারে বুঝে নেয়া যায়, তাহলে তার অভিভাবকগণ সেই মেয়ের এবং তার বংশের অবস্থা এবং দীনদারীর প্রতি দৃষ্টি দিবে। এভাবে সেটাও দেখবে যে, তারা দু'জনে মিলবে কি না। যদি দু'জনের মাঝে মিলে যাওয়ার গুণাগুণ দৃষ্টিগোচর হয় তবে সম্পর্ক স্থাপন করবে। এখানে এ কথা লক্ষ রাখবে যে, ছেলের মতের একেবারে বিপরীত অথবা তার না জানা অবস্থায় কোন জায়গায় সম্পর্ক স্থাপন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ জন্য যে, আজীবন তারা একসঙ্গে থাকবে। নতুবা তাতে ভয় থাকে, তাদের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হবে।

জোড়ের বদলে বেজোড় হবে। এজন্য তার জীবনের উপকারকে সামনে রেখে তার মর্জি সাপেক্ষে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। হ্যাঁ, যদি মাতা-পিতার এই ধারণা থাকে যে, ছেলে নিজের মন্দভাবের এবং মনের স্বাধীনতার কারণে আমাদের পছন্দনীয় জায়গা বাদ দিয়ে কোন ভুল জায়গায় নিজের সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়– তখন তাকে বুঝাতে হবে এবং যেখানে সম্পর্ক করতে চাচ্ছেন সেখানকার ভালো দিকগুলো তার জ্ঞানে দিতে চেষ্টা করা উচিত। এরূপ হাস্য রসিকতার সাথেও যদি সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং মাতা-পিতার দিক থেকেও কোন বাধার সৃষ্টি না হয়, তবুও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখা ভালো।

১. মেয়ের বয়স ছেলের বয়স থেকে কিছু কম হবে। অর্থাৎ মেয়ের বয়স ছেলে থেকে দু'চার বছর কম হবে।

২. যুবক ছেলের জন্য কুমারী মেয়ে অধিক প্রযোজ্য। কেননা হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তার মধ্যে অত্যন্ত মহব্বত ও সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

৩. সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে একজন অপরজনকে একবার দেখে দিবে। সুতরাং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হল– বিয়ের পূর্বে পাত্রীকে দেখে নাও। এইভাবে যেন দু'জনের মধ্যে মহব্বত ও মনুষ্যত্ব বাড়ে। এর কারণ এ-ও যে, কখনো এ রকম জায়গায় শুনা ও শুনানো কথার দ্বারা মানুষ নিজের মনে কেউ অনেক ভালো নকশা গেঁথে ফেলে। পরে তা সামনে আসার পর দ্বন্দ্ব-কলহে জড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় কারণ হলো, প্রত্যেক মানুষের পছন্দ পৃথক পৃথক হয়। হতে পারে, শুনেছে তার জন্য এ মেয়ে পছন্দনীয় হবে কিন্তু দেখা গেল তা তার পছন্দের বিপরীত। তাই নিজের পছন্দ নিজেই করে নাও।

৪. মেয়ে নির্বাচনকালে দেখা প্রয়োজন, তার দীনদারী, চরিত্র এবং তার সুন্দর স্বভাবের ব্যাপারে জ্ঞাত হওয়া দরকার। এ ধারাবাহিকতার ব্যাপারেও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী আমাদের জন্য ভালো পথের দিশা দেয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– মহিলাদের বিয়ে চার কথার মধ্য

থেকে কোন একটির প্রতি খেয়াল রেখে করবে। কারও সুন্দর দেখে, কারও তার সম্পদের দিকে লক্ষ রেখে এবং কারও বংশ মর্যাদার প্রতি (অর্থাৎ বড় ঘরের মেয়ে) লক্ষ করে। কিন্তু সফল ঐ ব্যক্তি যে তার দীরদারী দেখে বিয়ে করে। চিন্তা করে যদি দেখ তাহলে দেখা যাবে, প্রথম তিনটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পরে।

উদাহরণত সুন্দর বড় ভাল এবং আর্কষণীয় বস্তু। কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধুগণ! তা অতি দ্রুত বিচ্ছেদকারীও বটে। আল্লাহ না করুন, মুখে কোনো কিছুর দাগ আঘাত অথবা কোনো রোগ হলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এমনিভাবে সমস্ত প্রাথমিক সৌন্দর্য কয়েক বছরের মেহমান মাত্র। যৌবনের কিছু দিন অতিবাহিত হলে কিংবা সন্তানাদির ধারাবাহিকতা শুরু হলে সৌন্দর্যের আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। এ কথাটাও মনে রাখা উচিত, কেউ যদি কারও সৌন্দর্য তালাশ তখন দেখা যায় সেও নিজের সৌন্দর্যের উপর আনন্দিত হয়। তাই আগেই চিন্তা করে দেখা উচিত, সেই আনন্দিত অহংকারী ভাব সহ্য করা যাবে কি না। অতঃপর ঐ সৌন্দর্যের প্রতি অন্যের দৃষ্টিও পড়বে। একজন আকৃষ্ট হলে অন্যজনও তো সে রূপের প্রতি আগ্রহান্বিত হতে পারে। এমন তো নয় যে, তোমার বন্ধনে আসার পর লোকেরা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যেভাবে তুমি সৌন্দর্য-পিয়াসী সেও তো নিজের জন্য সৌন্দর্য কামনা করবে। তাই তোমার ব্যাপারে চিন্তা কর, তুমি তার মত কি না? নতুবা এমন হবে, তুমি তার পাগল, যে তোমার থেকে বিপরীত। তখন তুমি তার জন্য সব কিছু বিসর্জন দেবে কিন্তু সে তোমা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা চালাবে। এতে করে কী শান্তি কি হবে! এই জন্য দীনদারী ছেড়ে শুধু সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেয়া হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় নয়। তবে উভয় দিকই বিবেচনায় রাখা ভালো।

কিন্তু ব্যক্তি যদি এমন হয় যে, শুধু সম্পদকে গুরুত্ব দেয়া হলো আর প্রতিষ্ঠিত ও মর্যাদাশীল হওয়ার জন্য কোন সম্পদশালী মহিলাকে পছন্দ করলো আর মনে মনে ভাবলো এতে তার পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধি হবে এবং সম্পদশালীও হওয়া যাবে। তাহলে মস্ত বড় ভুল করা

হবে। কেননা, সেটা সৌন্দর্য মাধুর্যতা থেকেও অনেক বেশি ক্ষতিকর। যেমন- সিরিয়ার প্রভাতের বিলাসিতা দেখে যদি তোমাকে ভাবতে হয় যে, সে সম্পদশালী কি না ? তাহলে সেটাও তোমার জন্য ধোকা হবে। বরং তার ঘরওয়ালাদের সম্পদ দেখে তোমাকে ভাবা প্রয়োজন, সম্পদ কি তার সঙ্গে থাকবে? আর যদি আসেও তাহলে সেটা তোমার হস্তগত হবে কি না? তুমি একজন পুরুষ ও স্বামী হয়ে একটা নারীর মালের ফায়দার দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ! পরন্তু যদি সম্পদশালী হয়, তাহলে দেখতে হবে তার প্রয়োজন কতটুকু এবং রুচির পরিমাণ কতটুকু। এটা দিয়ে তোমার প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে কি না। প্রকাশ থাকে যে, হাতির খোরাক তার অস্তিত্ব সাপেক্ষে হতে হয়, নতুবা কারো কমান্ড মেনে চলে না। অতএব, সম্পদশালী একটি মেয়ে যে ঠাঁট-বাট নিয়ে সে বড় হয়েছে, লালিত পালিত হয়েছে, তোমার ঘরে আসলে তো তোমাকেও তার ভরণপোষণ তেমনিভাবেই করতে হবে। তখন যদি তুমি দুর্বল হও, তাহলে তোমার অনুগত হবে নাকি তোমার উপর হকিম হয়ে বসবে! এজন্য বুদ্ধিজীবীগণ বলেছেন, সম্পদের ব্যাপারে একজন নারী পুরুষের চেয়ে কম হওয়া প্রয়োজন। তাহলে স্ত্রী স্বামীভক্ত ও নিয়ামতের কদর করবে।

কিছু লোক এমন আছে যারা বিয়েতে বড় বাড়ি ও উচ্চবংশের নারী সন্ধান করে যেন তার মাধ্যমে তারাও সম্মানী হতে পারে এবং অন্যদের উপর গর্ব করতে পারে। কিন্তু এরূপ লোকদের খেয়াল রাখা উচিত, উঁচু বংশ কিংবা উঁচু-নিচুর মাসআলা অনির্দিষ্ট ও শরীয়তে গুরুত্বহীন একটি বিষয়। অতঃপর তার মধ্যেও বিভিন্ন হয়রানী ও পেরেশানী নিহিত থাকার কারণে তা সুখকর নয়। এজন্য পরিষ্কার কথা হচ্ছে, দীনদারী ব্যতীত সম্পদশালী সুন্দরী হওয়া, বংশ উঁচু হওয়া এসবই অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং দীনদারী নেই এমন নারীর অপবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জ্ঞানও থাকে না– যা তার প্রকৃত সম্পদ। এজন্য নারীদের দেখার বেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তার দীনদারী। যদি সে নামায রোযায় অভ্যস্ত হয়, ভালো চরিত্রবান এবং ঘরের কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, তার পরিবারও দীনদার হয় তা হলে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এর চাইতে বড় আর কোন নিয়ামত নেই। এটা

এমনই জোড়, যেটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেছেন। দীনদারীর ব্যাপারে আরেকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা দরকার। আর তা হচ্ছে তার আকিদা দৃষ্টিভঙ্গি ও মেজায কেমন? তার মধ্যে ঈমানী স্পৃহা আছে কি না। নতুবা আল্লাহ না করুক, সে যদি জাগতিক শিক্ষা এবং বেহায়াপনা ও বেপর্দা হয় তা হলে তো ভয়ানক অবস্থা। কেননা, দেখা যাবে স্বামী প্রবরকেও তাতে জড়াবে এবং স্বীয় সন্তানদেরকেও সে দিকে ধাবিত করে ফেলবে। এক্ষেত্রে মহিলাগণ খারাপ ভাষা ও মন্দ বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ভ্রমণ তথা ঘোরাফেরা করার প্রেমে পড়ে যায় এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে। এ ধরনের মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক করলেও কোনো ফায়দা হয় না। পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ করা যেতে পারে–

১. সুস্থ হওয়া, কোন ক্ষতিকর রোগ-বালাই না থাকা এবং সর্বাবস্থায় রুগ্ন না হওয়া।

২. স্বীয় বংশের হওয়া ভালো। কেননা তাতে আন্তরিকতা থাকে।

৩. দু'জনের মেজায এক ধরনের হওয়া। উদাহরণত, একজন খুবই সৌখিন অন্যজন একেবারে সাদাসিধে মেজাযের অধিকারি হলে শান্তিপূর্ণ জীবন কঠিন হয়।

৪. দীনি শিক্ষাসহ কোন রকম লেখাপড়া জানা। একেবারে মূর্খ না হওয়া। এ কথাগুলোর প্রতি লক্ষ করা, ছেলের পক্ষের জন্য যেমন তেমনি মেয়ে পক্ষের জন্যও। তারপর যখন প্রস্তাব পাঠানোর ইচ্ছে করবে তখন সুন্নত তরিকা হচ্ছে ওযু ও গোসল করে চার রাকাত নামায পড়বে। দু'রাকাত সালাতুল হাজত এবং দু'রাকাত সালাতুল ইস্তেখারার নিয়ত করে নামায আদায় করবে। এই দুই নামাযের মধ্যে হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ পড়বে। তারপর দুআ করবে– হে আল্লাহ! জীবনে ভালো একজন সাথী দান কর এবং তার পূর্ণতার সকল আসবাব গায়েব থেকে ব্যবস্থা করে দাও। বিয়ের বিভিন্ন জায়গায় যদি দুআ ইত্যাদি পাবন্দি হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ তা অনেক উপকারী হবে।

বিয়ের প্রস্তাবের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি নেই। এটা শুধু ছেলে এবং মেয়ের অভিভাবকদের পরস্পরের একটি অঙ্গীকার মাত্র। অভিভাবক

চাইলে সেটা মৌখিক কথাবার্তার মাধ্যমে অথবা লেখার মাধ্যমে কিংবা বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে হোক, দিতে পারে। সম্পর্ক হয়ে যাওয়া এক ধরনের অঙ্গীকার এবং পরস্পরের অঙ্গীকার সেটাই যা যথাসম্ভব প্রত্যাখ্যাত না হয়। নতুবা সেটা মন্দ অঙ্গীকার হবে আর সেটা শরীয়তে অত্যন্ত না পছন্দ। সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর দু'পক্ষের অভিভাবকগণের মৌখিক, লিখিত অথবা কোন লোকের দ্বারা বিয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করে রাখা ভালো। এছাড়া তাতে যত ধরনের ভুল প্রথা প্রবর্তিত হবে এ সবগুলোই মন্দ এবং বেকার বলে বিবেচিত হবে, যা থেকে সবারই বেঁচে থাকা উচিত। এ সম্পর্কের পর বিয়ের যে তারিখ নির্ধারিত হবে সে অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের উপস্থিতিতে একেবারে সাদাসিধে বিয়ের কাজ সম্পাদন করে নিবে।

বিয়ের আদব

বিয়ের অনেক আদব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আদব হল– বিয়েতে নিয়ত ভাল রাখা। এজন্য যে দুনিয়ার জায়েয কাজের মধ্যেও যদি নিয়ত ভাল হয় তাহলে তাতে সওয়াব মিলে। অতঃপর বিয়ে তো সুন্নত। তাতে যতটুকু নিয়ত ভাল হবে তেমনি সওয়াবও মিলবে। তারপর এই কাজে আরও কয়েকটি নিয়তও হতে পারে এবং এ সমস্ত নিয়তের উপর পৃথক পৃথক সওয়াবও পাওয়া যাবে। এ অনুযায়ী বিয়ে একটি আমল। যত বেশি ভাল নিয়ত হবে তত বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে।

বিয়েতে নিম্ন বর্ণিত নিয়তসমূহ হতে পারে :

১. বিয়ে এ জন্য হওয়া যে, এটি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। সুতরাং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

النكاح من سنتى

এবং সুন্নতের উপর আমল করার মাধ্যমে সওয়াব পাওয়া যায়।

২. বিয়ের মাধ্যমে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যায়। এ বিয়ের মাধ্যমে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং মনের এদিক সেদিক খেয়াল থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখা যায়।

৩. আল্লাহ তাআলা বিয়ের মাধ্যমে নেককার সন্তান দান করেন। আর সন্তান যে নেক কাজ করে এবং পিতা-মাতার জন্য দুআ করে, তাতেও সওয়াব পাওয়া যায়।

৪. সন্তানাদি আছে এমন লোকের ইবাদতের সওয়াব, বিবাহবিহীন লোকের ইবাদতের সওয়াব অপেক্ষা বেশি হয়। তাই বেশি সওয়াবের জন্যও বিবাহের নিয়ত করা ভালো।

৫. বিয়ের মাধ্যমে যতগুলো সন্তান হবে তা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত বৃদ্ধির কারণ হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারেও গর্ববোধ করেন।

৬. আল্লাহ তাআলা এরূপ সন্তান দান করবেন, যে আল্লাহর দিকে আহ্বানের কাজে মেহনত করবে। এর মাধ্যমে উম্মতকেও দীনি ফায়দা দিবে। এমন সন্তান পিতা-মাতারও উত্তম সওয়াবের কারণ হবে।

৭. যদি ছোট শিশু মারা যায় তখন পিতা-মাতার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির এবং জান্নাতে প্রবেশের উসিলা হবে। এভাবে বিয়েতে যতগুলি নিয়ত করা হবে ততটুকুই অতিরিক্ত সওয়াব হবে এবং দীনি ও দুনিয়াবী অনেক বরকত হাসিল হবে। না বুঝে বিয়ে করা অথবা শুধু যৌন চাহিদা এবং দুনিয়াবী স্বাদ আস্বাদনের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা মুমিন তথা মুসলমানদের শান নয়। বরং শুধু পশুত্বের কাজ হবে।

টীকা :

১. বিয়ে-শাদীর একটি বড় কৌশল শান্তিময় জীবন ও বাসস্থান হওয়া। আর সেটা এভাবেই প্রকাশ হবে, যখন মানুষের বিবেক ও তার উপকারের দিকে মনোযোগ দেবে। ভালবাসা ও আন্তরিকতার যে যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছেন সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালনার সংকল্প করা।

২. বিয়ের দ্বিতীয় আদব এই যে, বিয়ে ঘোষণার মধ্যে হওয়া উচিত।

اعلنوا النكاح ولو بالدف

কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হচ্ছে–

বিয়ের ঘোষণা কর, যদিও সেটা ঢোল বাজিয়েও হয়। যেন তা চুপচাপ না হয়। যিনা এবং বিয়েতে এটাই প্রার্থক্য যে, যিনা (যা হারাম) চুপে চুপে হয় এবং বিয়ে (যা হালাল) সেটা সমাজের সামনে হয়।

৩. তৃতীয়ত এই যে, বিয়ে মসজিদে হবে। এভাবে যে কোন নামাযের পর এবং বিশেষ করে জুমআর দিন জুমা অথবা আসরের নামাযের পর পড়ানো অত্যন্ত ভাল। এভাবে সময় ও স্থানের উভয়টিরই বরকত হাসিল হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে উলামা এবং সৎ লোকদের সমাবেশ যত বেশি হবে তত ভাল। কেননা তাদের দুআও তাতে সর্বাবস্থায় কাজে আসবে এবং রহমত ও বরকত হবে।

৪. বিয়ে কোন আলেম অথবা পুণ্যবান ও সৎ লোক পড়াবে। প্রথমে খুৎবা পড়ে তারপর ইজাব ও কবুল পড়াবে। তাতে এ কথা লক্ষ রাখবে, বিয়ে করণেওয়ালা ব্যক্তি কবুল বলার সময় সঠিকভাবে বলেছে কি না।

৫. বিয়ে পড়ানোর পর বন্ধু-বান্ধব মোবারকবাদ দিবে। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে এই দুআ এসেছে–

بارك الله فيكما وجمع بينكما بخير واخرج منكم الطيب

আল্লাহ তাআলা তোমাদের দু'জনের মধ্যে বরকত দান করুন, ভাল ও আন্তরিকতার সাথে মিলিত করুন এবং নেক সন্তান তোমাদের থেকে সৃষ্টি করুন।

৬. বিয়ে পড়ানোর পর মিষ্টান্ন জাতীয় দ্রব্য বণ্টন করা অথবা ছিটানো মুস্তাহাব। তাতে খেয়াল রাখতে হবে, মসজিদে যেন হৈ-হুল্লা না হয় এবং এর পবিত্রতার খেলাপ যেন না হয়।

৭. বিয়ের মহর অতিরিক্ত না হওয়া; বরং মধ্যপন্থায় হওয়া। এভাবে বিয়ের প্রত্যেক কাজে যেন ইসরাফ (প্রয়োজনাতিরিক্ত) খরচ না হওয়া। বরং ইনসাফের সাথে কাজ করা উচিত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنه

বিয়েতে যত খরচ কম হবে তত বরকত বেশি হবে।

সুতরাং যতটুকু কম হলে হয় এবং খরচ কম হবে এবং সহজতার সাথে কাজ সম্পাদন করবে ইনশাআল্লাহ ততটুকু বরকত হবে। এমনিভাবে মেয়েকে যৌতুক দেয়াতে অতিরিক্ত কষ্ট না করা উচিত। চিন্তা করো, হযরত ফাতেমা (রা.)-এর যৌতুক কী ছিল। দুটি ইয়ামনী চাদর ও দুটি তোষক। যার মধ্যে বালিশ, একটি কমলি, একটি পেয়ালা, একটি চাক্কি, একটি মটকা এবং পানি রাখবার পাত্র। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে– একটি খাটিয়াও ছিল।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন– যৌতুকের ক্ষেত্রে তিনটি বস্তুর দিকে লক্ষ রাখা উচিত।

এক. সংক্ষিপ্ত, কালক্ষেপণ না করা, অতিরিক্তের দিকে লক্ষ না করা।

দুই. প্রয়োজনীয় বস্তুর দিকে লক্ষ রাখা যেন বস্তুটি নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়– এমন বস্তু দেয়া।

তিন. প্রচার না করা। মূলত এটা তো স্বীয় সন্তানের প্রতি দয়ার প্রকাশ। এটা অন্যকে দেখানোর প্রয়োজন কি?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম থেকে যে বর্ণনা উল্লেখ আছে তাতে এ তিন বস্তুর হুকুম ছাবিত রয়েছে।

কনে উঠিয়ে দেওয়ার ইসলামী রীতি

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মেয়েকে তার স্বামীর কাছে পৌঁছানো অথবা যাওয়াকে রুখসত বলে। আর সেটাও অত্যন্ত সহজলভ্যভাবে হওয়া উচিত। মেয়ের পিতৃপক্ষরা যদি চায় নিজের ঘরের কোন মহিলা অথবা খাদিমা দ্বারা অথবা ছেলে পক্ষের আগত মহিলারা যদি সাথে থাকে– বরের কাছে পাঠিয়ে দিবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহেবজাদী সাইয়েদা হযরত ফাতেমা জোহরা (রা.)কে উম্মে আয়মন (রা.)-এর সাথে (যিনি হুজুরের খাদিমা ছিলেন) হযরত আলী (রা.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। উঠিয়ে দেয়ার বিশেষ কোন পদ্ধতি শরীয়তে নেই। শরীয়ত নির্দেশিত পন্থা ছাড়া কোন রুখসত তথা রেওয়াজের অনুসরণ করা যাবে না। তেমনিভাবে এটাও প্রয়োজন নেই যে, যে সামানা মেয়েকে

যৌতুক হিসাবে দেয়া হয়েছে সেটা তখনই সাথে সাথে পাঠিয়ে দিতে হবে। বরং তা পরে পাঠালেও হবে।

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব

বিবাহ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি অন্যতম সুন্নত। উম্মতের প্রত্যেককে তিনি বিবাহের জন্য তাকিদ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে– যে ব্যক্তি বিবাহের ক্ষমতা রাখে অথচ বিবাহ করে না, সে আমার তরীকায় নেই। বিবাহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা রূমের ২১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তাআরা ইরশাদ করেন– আল্লাহ পাকের অপার কুদরতের একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি-স্বস্তি লাভ কর। আর তিনি তোমাদের মাঝে প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসা দান করেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়ে বলেন, তোমরা বাকিরাহ– সতীত্বসম্পন্না কুমারী মেয়েদের বিবাহ কর। কেননা তারা অধিক মিষ্টভাষী, বেশি সন্তান প্রসবকারিনী এবং কমে সন্তুষ্ট। *[ইবনে মাজাহ]*

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদেরকে হুশিয়ার করে বলেন, তোমরা খাযরায়ে দামন মেয়ে লোককে বিবাহ করো না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তারা কারা? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চরিত্রহীনা সুন্দরী। *[বুস্তানুল আরেফীন]*

বিবাহের ফজিলত

গুরুত্বের পাশাপাশি বিবাহের অনেক ফজিলতও রয়েছে। তাজদারে মদীনা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বান্দা যখন বিবাহ করল সে তার অর্ধেক দীন পূর্ণ করল। তাই তার কর্তব্য বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। *[মেশকাত শরীফ]*

সরদারে দু'জাঁহা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিবাহিতদের দুই রাকাত (নফল) নামায অবিবাহিতদের সত্তর রাকআত হতে উত্তম। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন স্বামী যখন তার স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করে স্ত্রী তার স্বামীর দিকে তাকায়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি করেন। আর স্বামী যখন তার স্ত্রীর হাত ধরে তখন উভয়ের পাপসমূহ তাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ে। নবীজী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর সুখ-সম্ভোগ ও হাসি-তামাশা দেখে খুশি হন এবং এ কাজের জন্য তাদের আমলনামায় সওয়াব লেখেন। আর তাদের জন্য হালাল রিযিকের ব্যবস্থা করেন। *[কানযুল উম্মাল]*

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইসলামী বিবাহ-বিধি

বিয়ে দেরিতে করা উচিত নয়। ইসলামের হুকুম হল– ছেলেমেয়ে বালিগা হওয়ার পর অনতিবিলম্বে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে বিবাহ দানে অধিক বিলম্ব করলে যদি এরই মধ্যে তারা কোন গুনাহে লিপ্ত হয়, তাহলে তার শাস্তির ভাগীদার অভিভাবকরাও হবেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও প্রাপ্ত বয়স্কদের বিবাহে বিলম্ব করা অনুচিত। কিডনীর ডাক্তার ওয়াচার লোহাক বলেন, যদি কেউ পরিণত বয়স হয়ে যাওয়ার পরও বিয়ে করতে দেরি করে, তবে তার সেক্স হরমোন কমতে কমতে এক সময় তা নিঃশেষ হয়ে যায়। বৃক্ক গ্রন্থির রস কমে গিয়ে প্রথমে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং পরে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে ছেলেমেয়েদের বিবাহ না হলে সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধির আশংকা বেড়ে যায়। তারপর যদি সে বিবাহ করেও ফেলে তবুও তার সেই পূর্বোক্ত অপকর্মের অভ্যাস বা জের থেকে যায়। যার ফলে সে আজীবন তাতে ভুগতে থাকে এবং দেহ ও চরিত্র নষ্ট করে ফেলে। এভাবেই দিন দিন সমাজ-অবনতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগে সামাজিক অপরাধের মূলে রয়েছে যুব সমাজের অপরাধ প্রবণতা। সামাজিক নানা অশ্লীল উপকরণের পাশাপাশি তাদের বিবাহ বিলম্ব ক্রমশ তাদেরকে নানা অনৈতিক অপরাধ, চারিত্রিক অবক্ষয় ও যিনা-ব্যভিচারের পর্যায়ে ধাবিত করছে। এ বিপর্যয়

থেকে রক্ষা পেতে হলে ইসলামে বর্ণিত বিবাহ-নীতি বাস্তবায়ন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বৈধ মিলনের উপকারিতা

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর বৈধ মিলনকে উৎসাহিত করেছে। স্বামী-স্ত্রীর সোহাগ-সম্ভোগ, প্রেম-ভালোবাসা ও মিলন-সহবাস দ্বারাও সওয়াব লাভ হয় বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি ইসলাম স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য সকলের মিলন-সম্ভোগকে অবৈধ ও হারাম ঘোষণা করেছে। বিজ্ঞানের আলোকে জানা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্রেনের চাপ ও মস্তিষ্কের খিচুনি থেকে মুক্তি দেয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উন্নত থেকে উন্নততর করে এবং শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; কিন্তু এ ক্রিয়া দ্বারা তখনই সবচেয়ে বেশি ফায়দা লাভ করা যায়, যখন শুধুমাত্র নিজের স্ত্রীর সাথে মিলন হয়। কারণ, পরনারীর সাথে মিলনকালে মস্তিষ্কে পাপানুবোধ এবং চারিত্রিক অপরাধবোধ থাকার ফলে মিলন দ্বারা ফায়দার স্থলে ক্ষতির আশংকাও বিদ্যমান। তা অনেক সময় এইডসসহ নানা দুরারোগ্য রোগের জন্ম দিতে পারে।

বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান বলে, আপনি যদি সুস্থ থাকতে চান তাহলে বিবাহ করুন। আমেরিকান ডাক্তারদের বর্তমান পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী কুমারদের তুলনায় বিবাহিতরা অধিক সুস্থ থাকে। রিসার্চ অনুযায়ী, বিবাহিত লোকদের নেশার প্রতি আগ্রহ কম। তারা নিজেদের খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে। এক সঙ্গী সকল ব্যাপারেই অপর সঙ্গীকে সহায়তা করে। তারা নিয়মিত টৈন চাহিদা পূরণের পরিমিত কসরত করে।

ঊনিশ হাজার লোকের উপর জরিপ চালানোর পর দেখা গেছে, এ্যাজমা থেকে মাথা ব্যথা পর্যন্ত প্রায় সকল রোগে কুমারদের তুলনায় বিবাহিতরা কম আক্রান্ত হয়। এভাবে ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ পথে নানা ক্ষতি ও অমঙ্গল রয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মতে চলে মুসলমানগণ জাগতিক কল্যাণ লাভের পাশাপাশি পরকালীন কাঙ্ক্ষিত কামিয়াবী অর্জনে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

নববধূর জন্য জরুরি উপদেশ

নববধূর উদ্দেশে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) গুরুত্বপূর্ণ নসিহত প্রদান করেছেন, যার মাধ্যমে তার জীবন সুন্দর ও সুখী হতে পারে। নিম্নে থানভী (রহ.) দেয়া কতিপয় উপদেশাবলী পেশ করা হলো–

❖ স্বামী যদি কখনও তোমার উপর রাগান্বিত হয়, তবে তুমি এমন কোন কথা বলবে না বা এমন কোন ব্যবহার করবে না যাতে তার রাগ আরো বৃদ্ধি পায়। বরং এমন ব্যবহার করবে, যাতে তার রাগ নিঃশেষ হয়ে যায়। সব সময় মাথা খাটিয়ে মেজায বুঝে কথা বলবে।

❖ যদি বুঝ যে, স্বামী এখন হাসি-মজা করলে সন্তুষ্ট হবে, তাহলে হাসি-মজার কথা বলাতে দোষ নেই। আর যদি বুঝ যে, সে এখন হাসি-মজাক পছন্দ করবে না, তবে সে সময় কিছুতেই হাসি-মজার কথা বলবে না। মূল কথা এই যে, স্বামীর মেজায বুঝে তোমার চলা দরকার।

❖ স্বামী যদি কোন সময় গোস্বা করে কথা না বলে, তাহলে তুমিও মুখ ফুলিয়ে বসে থাকবে না। বরং খোশামোদ করে, কাকুতি মিনতি করে, হাত জোড় করে, পা ধরে তোমার অপরাধ না হলেও অপরাধ স্বীকার করে অথবা স্বামীর অন্যায় হলেও তুমি তোমার নিজের অন্যায় মেনে নিয়ে মাফ চাইবে এবং যে প্রকারেই হোক না কেন, স্বামীর মন সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। কখনও তুমি গোস্বা করবে না, বেজার হয়ে বসে থাকবে না; বরং মনে রাখবে, স্বামীর হাত পা ধরে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে, তাতেই প্রকৃত সুখ-শান্তি ও মর্যাদা নিহিত।

❖ স্বামীর আর্থিক সামর্থের বেশি খরচ বা কোন অতিরিক্ত জিনিসের দাবী করবে না।

❖ স্বামীর যেমন অবস্থা, স্বামীর শাক-ভাত, মোটা কাপড় যখন যেমন যোগাতে পারে তাতেই খুশি হয়ে হাসি মুখে, সন্তুষ্টচিত্তে জীবন যাপন করবে।

❖ স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে না, কোন কাজ করবে না। এমনকি স্বামী যদি দিনকে রাত, রাতকে দিন বলে তবে তারও প্রতিবাদ করবে না।

❖ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন দু'এক দিনের জন্য নয়। আজীবন স্বামীর সাথে একত্রে বসবাস করতে হবে। এরূপ অবস্থায় খোদা না করুন, যদি উভয়ের মধ্যে কিছু গরমিল এসে যায়, তবে তার চেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় জগতে আর নেই। অতএব স্ত্রীর প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, যাতে সে সর্বদা স্বামীর মন রক্ষা করে চলতে পারে। স্বামী যদি হুকুম করে যে, সারা রাত্রি হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাক, তবে তৎক্ষণাত তাই করবে। মনে রাখবে, এতেই তোমার জীবনের সুখ নিহিত।

❖ নিজের কথার উপর কখনও জেদ করবে না। স্বামী যদি কোন কথা তোমার মতের বিরুদ্ধেও বলে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকবে। পরে হয়তো সুযোগমত সময়ে বুঝিয়ে দিবে বা বুঝে নিবে।

❖ বেশি কথা বলবে না। আর এটাও করবে না যে, একেবারে কথা বন্ধ করে আছ। বার বার জিজ্ঞাসা ও খোশামোদ করার পরও তোমার পক্ষ হতে কোন উত্তর নেই। উভয়টিই অন্যায়।

❖ স্বামীর বাড়িতে গিয়ে যারা বড় তাদেরকে সম্মান করবে, যারা ছোট তাদেরকে স্নেহ করবে। নিজের দায়িত্ব মনে করে কাজকর্ম করবে। নিজের কাজ কখনও অন্যের ঘাড়ে ফেলবে না। বরং অন্যের কাজও সম্ভব হলে কিছু করে দিতে চেষ্টা করবে।

❖ শাশুড়ি, ননদেরা বা জায়েরা যে কাজ করে, সে কাজ করতে তুমি কখনও লজ্জা বা অপমানবোধ করবে না; বরং তাদের কাজ তুমিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে দিবে। এরূপ করলে তাদের মন জয় করে নিতে পারবে।

❖ দু'জনকে চুপি চুপি কিছু কথাবার্তা বলতে দেখলে তুমি সেখান থেকে সরে যাবে। পাছে কান লাগিয়ে তাদের কথা শুনবে না অথবা এরূপ মনে কুধারণা করবে না যে, তারা বুঝি তোমার সম্পর্কে কিছু বলাবলি করছে। এ কথাগুলোর উপর যে মহিলা আমল করে চলবে, স্বামীর ঘরে সে সুখ পাবে, সংসারে শান্তি পাবে। পাশাপাশি মানুষের কাছে সম্মান পাবে এবং আল্লাহর ভালোবাসার পাত্রী হবে। পক্ষান্তরে নিজের অযাচিত অধিকার খাটাতে গিয়ে স্বামীর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে মুখের উপর কথা বললে কিংবা নিজের স্বপ্ররোচিত পজিশন রক্ষা করার নামে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করলে, সে

দাবী বা মর্যাদা আদায়ের মিথ্যা প্রবোধ লাভ করলেও স্বামীর সংসারে কখনও সুখ শান্তির মুখ দেখবে না। স্বামীর নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তাআলার কাছেও ঘৃণিতা হবে। আর সেই ঔদ্ধত্যের কাজে আশপাশের লোকদের থেকে সাময়িক কিছু বাহবা বা কুমন্ত্রণা পেলেও ক্রমান্বয়ে সে সকলের নিকটই অবাঞ্ছিতা ও অবজ্ঞার দুর্ভাগা বিবেচিত হবে। আধুনিক অধঃপতিত এ রকম প্রবঞ্চনার চাতুরি জীবনের চেয়ে শান্তিময় সরল নম্র ইসলামী জীবনই কি ভাল নয়? সকল নবধূর এ শিক্ষা সদা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখা কর্তব্য।

বাসর-রাত্রি কীভাবে অতিবাহিত করবেন

যখন বিয়ে এবং পাত্রী উঠিয়ে দেওয়া সম্পন্ন হয় এবং কনেকে স্বামীর বাসস্থানে নিয়ে আসবে, তখন এটা বিশ্বাস্য যে, তাদের মিলন হবে। এসব ক্ষেত্রে ধারাবাহিক কিছু আদব ও উসুল স্মরণে রাখা উচিত–

১. স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বে অথবা বিয়ের পূর্বের দিন এমনভাবে যেন অতিবাহিত না হয় যে, দু'জনে পেরেশানওয়ালা বা আরামের কোন জায়গা না পায়। বরং দিনে জায়গা নির্বাচন করে কিছু সময় দু'জনে আরাম করা অর্থাৎ ঘুমানো উচিত। তবে দু'জনের মুলাকাতের সময় চাহিদা হবে সমান এবং শরীরের মধ্যে শক্তি থাকতে হবে।

২. মিলনের আসবাব সহজে সংগ্রহে এসে গেলে তখন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করে নেয়া উচিত। উদাহরণত ফল অথবা মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি সুগন্ধি এবং গৃহের কিছু সাজ কোথাও কোথাও তার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। বাসর ঘরকে সাজানোর জন্য হাজার হাজার টাকা-পয়সা খরচ করা হয়। এটা ইসরাফ তথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ। এর দ্বারা গুনাহ হবে। অতিরিক্ত খরচ করা শয়তানের কাজ, যেহেতু তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৩. যদি মহরে মোয়াজ্জল (নগদ মহর)-এর রেওয়াজ না থাকে, তাহলে অন্য যে কোন বস্তু হলেও মহরের অনুসরণ করে তা হাদিয়া হিসাবে দেয়া উচিত। এমনটা করা না হলে তা থেকে উপকার লাভ করা পুরুষত্বের সম্মানের খেলাফ।

৪. প্রথম সাক্ষাতে কথাবার্তার পূর্বে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলবে। তারপর স্ত্রীর ললাট এবং তার চুলের উপর হাত রেখে এই দুআ পড়বে–

اللهم انى اسئلك من خيرها وخيرما فيها وخيرما
جبلتها عليه واعوذبك من شرها وشرما فيها
وشرما جبلتها عليه

৫. এটাও আদবের অন্তর্ভুক্ত যে, প্রথমে ওযু করবে। তারপর দু'রাকাত নামায 'সালাতুল হাজত' পড়ে খায়ের ও বরকত এবং সম্পর্ক মহব্বত ও পবিত্রতার সাথে সর্বদা চলাফেরার ও নেক সন্তানাদির জন্য দুআ করবে। সলফে সালেহীন ও বুযুর্গদের থেকে সেই আমলেরই তথ্য পাওয়া যায় যে, তাঁরা দু'চার রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করেছেন। অতঃপর স্থান বিশেষ স্বীয় নববধূর নিকট অত্যন্ত সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসবে। তখন দুনিয়া-বিমুখ তথা দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং সম্পদের মূল্যহীনতা সম্পর্কে আলোচনা করবে। তাহলে অন্তরে সম্পদের মহব্বত কমবে এবং তার মধ্যে দীনদারীর ভাব সৃষ্টি হবে। সাথে সাথে নিজের সম্পর্ক, ভালোবাসা এবং বিয়ের পূর্বের জীবনের সদ্ভাব ও বিয়ের পরের সম্পর্কের আলোচনা তথা মহব্বতের কথা বলবে। এ কথা খুবই লক্ষ রাখবে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিয়ের আগে বেগানা এবং একেবারে অজানা অচেনা ছিলে, পরস্পরে কোন রকম পরিচয় বা সম্পর্ক ছিল না। এখন যেহেতু বিয়ের মাধ্যমে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তাই সেটা স্পষ্ট যে, একেবারে পুরোপুরিভাবে কারও চেনাজানা হয়নি। কারণ সে তো জ্ঞাতসারে সামনে আসেনি। এজন্য সহবাসের (মেলামেশা) মাধ্যমে যা সর্বশেষ মাধ্যম। তাই তাড়াহুড়ো যেন মোটেই না করা হয়; বরং অর্ধেক রাত্রি তো তার সঙ্গে শুধু সম্পর্ক গড়া তথা ভালোবাসা ও আমোদ-ফুর্তির কথা বলে সময় কাটানো উচিত। তারপর ধীরে ধীরে তাকে নিজের দিকে ধাবিত করতে হবে এবং নিজের কাছে নিতে হবে। কেননা সহবাস তথা মেলামেশার জন্য তো পুরো জীবনই পড়ে রয়েছে। কিন্তু যদি চূড়ান্ত দ্রুততার সাথে কাজ হয় তবে তাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। স্ত্রীর মনে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু যৌনক্ষুধা নিবারণ বৈ কিছু নয়।

ক. প্রকাশ থাকে যে, মহিলাগণ জন্মগতভাবে লজ্জাবতী হয়। তারা দ্রুততার সাথে সহবাসে জড়াতে চায় না। আর যদি হয়েই যায় তবে তার চাহিদার মধ্যে অতি দ্রুত ভাটাও পড়ে না। এজন্য পুরুষের প্রথম পালা থেকে খারিজ হওয়ার পর তাদের চাহিদা অসম্পন্ন থাকে এবং তার দ্বারা সে কোন স্বাদও পায় না।

খ. প্রথমবার সহবাসের ফলে কুমারিত্বের পর্দা টলে যায় এবং কিছুটা কষ্টেরও হয়। এমতাবস্থায় নারীদের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি না হওয়ার কারণে এই কষ্টের খুবই প্রভাব পড়বে। সেটা তার শারীরিক ক্ষতি এবং স্বামীর পক্ষ থেকে কষ্টদায়ক অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবার কারণ হয়ে যায়। নারীকে নিকটবর্তী করা এবং তাকে আয়ত্তে আনার জন্য এই কথাগুলোও স্মরণ রাখা উচিত যে, বিয়ের পর এক নতুন পৃথিবী সামনে আসে এবং তাতে অনেক আশ্চর্য আশা-আকাঙ্ক্ষা মনে আসে। আর মন উদাসী হয়। এমতাবস্থায় নিজেকে নিজে সামলিয়ে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, একবারে অতিরিক্ত প্রেমপূর্ণভাব যেন প্রকাশ না পায়। নতুবা সে আপনাকে গোলাম তথা খাদেম মনে করে বসবে। অতঃপর স্বীয় কথাবার্তাকে বিরূপ করতে মনে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। তাই নারীদেরকে মালিকও বানিও না, সেবিকাও মনে করো না। কেননা তাতে সে উত্তেজিত হতে পারে এবং কথা বলতেই সে রাগ করতে পারে। লক্ষ রাখতে হবে, আমাদের আস্থার সৃষ্টি হোক, এরূপ ধারণা যেন সৃষ্টি না হয় যে, স্ত্রীর মনে স্বামীর বিপরীত মন্দভাব সৃষ্টি হবে। নারী ঘরের রক্ষণশীলা হয়ে এসেছে। প্রকৃতিগতভাবে সে মাহবুবাও বটে। আপনার জীবন-সঙ্গিনী ও নিজ গৃহের ভেতরকার কাজগুলোতে সে সাহায্য ও সহযোগিতাকারিনী। এজন্য মহব্বত ও আন্তরিকতার বন্ধন প্রকাশের সাথে সাথে নিজের ব্যক্তিত্ব ঠিক রাখতে হবে। তবে এমন যেন না হয় যে, সে আপনার ঘরের হাকিম হয়ে চেপে বসে।

একটি সতর্কবাণী : কিছু কিছু লোক বাসর রাতকে শবে কদরের রাত্রির মতো পুণ্যময় ও দুআ কবুলের রাত্রি মনে করে। এ থেকে বাড়িয়ে এরূপ ধারণা করা অত্যন্ত ভুল এবং তা শিকড়বিহীন। শরীয়তে তার কোন অস্তিত্ব নেই। এভাবে কেউ মনে করে, মহরের পয়সা অত্যন্ত পবিত্র এবং এটাও প্রসিদ্ধ যে, রোগী ব্যক্তিকে চিকিৎসা করানো উচিত। তাতে সে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে। তাই তার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, মহরের পয়সা নারীর

জন্য হালাল এবং পবিত্র। হালাল পদ্ধতিতে অর্জিত মাল ও তার দ্বারা রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসা করলে সে দ্রুত ভালো হয়ে যাবে এমন কথা কোথাও লেখা দেখিনি।

সহবাসের আদব

সহবাস (মিলন তথা দৈহিক মিলনের) মানুষের জন্মগত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, যা ব্যতীত মানুষের সহীহ পদ্ধতিতে জীবন যাপন অতিবাহিত করা কঠিন; বরং এটা অসম্ভব। আল্লাহ তাআলা এই খাহেশের পূর্ণতার জযবা শুধু মানুষের মধ্যেই দেননি; বরং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে রেখেছেন। কিন্তু শরীয়তে মানুষের এই জন্মগত চাহিদার পূর্ণতার জন্য কিছু আদব এবং পদ্ধতি রাখা হয়েছে যেন মানুষ এবং প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। যদি সহবাসের উদ্দেশ্যে শুধু খাহেশের পূর্ণতাই হতো তা হলে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য থাকত না। এজন্য তার কিছু আদবের অনুসরণ করার সাথে সাথে মনুষত্বের প্রতি লক্ষ রাখা দরকার। অতঃপর পবিত্র শরীয়ত সহবাসকে মানুষের মানবিকতার সাথে শরীয়তের হকও করে দিয়েছে। এজন্য তাতে অনেক ফজিলতও বর্ণনা করা হয়েছে, যেন এ কাজের মাধ্যমে একজন মুসলমানের সওয়াবও মিলে। সুতরাং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করাও সদকা সমতুল্য এবং তাতে সওয়াব মিলে। সাহাবায়ে কেরামগণ আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মনের চাহিদা পুরণ করলেও কি সওয়াব মিলবে?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– যদি তার এই খাহেশ কোন ভুল জায়গায় পূর্ণ করতো তা হলে কি তাতে গুনাহ হতো না!

সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই!

অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যখন কোন ব্যক্তি গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য হালাল জায়গা বেছে নিবে তখন তাতেও সওয়াব হবে।

লক্ষ করে দেখুন, আল্লাহ তাআলার কত বড় রহমত তাঁর হুকুম মান্যকারীদের উপর।

সহবাসের আরও কতিপয় আদব নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. সহবাসের একটি আদব এই যে, প্রথমে স্ত্রীকে ভালবাসা এবং চুমু ইত্যাদি দ্বারা আয়ত্তে নিয়ে আসা। এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা যার দ্বারা সে সহবাসের দিকে অগ্রসর হয়। নারীকে সহবাসের দিকে ঝুকানো এবং তার খাহেশকে বাড়ানোর অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা নারীর মেজায ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন রকম হয়। উদাহরণত আদর মহব্বতের কথাবার্তা বলা, চুমু খাওয়া, শরীর একত্রিত করা ইত্যাদি। চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদগণ লেখেন, নারীর মধ্যে শারীরিক উত্তেজনা দু'স্তনে ঘর্ষণে দ্রুত সৃষ্টি হয়। চিকিৎসকগণ এ ব্যাপারে এও বলেন যে, নারীদের দেহের মধ্যে যৌন উত্তেজনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঙ্গে হয়ে থাকে। যাকে স্পর্শ করার মাধ্যমে এবং ঘর্ষণের দ্বারা যৌন উত্তেজনা বেড়ে ওঠে। বিভিন্ন কারণ থেকে তা অনুমান পাওয়া যায়। এহেন অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণভাবে তার জৈবিক চাহিদা সে নিজে প্রকাশ না করবে বিভিন্নভাবে, যেমন- স্বামীকে নিকটবর্তী করা, চোখে যৌনক্ষুধার ভাব প্রকাশ পাওয়া, স্বামীর শরীরে হাত উঠানো। তাকে চুমু খাওয়া, নিজের শরীরের কাপড় দ্বারা স্বীয় শারীরিক সৌন্দর্য প্রকাশ করা ইত্যাদি– ততক্ষণ পর্যন্ত সহবাসে লিপ্ত না হওয়া পুরুষের জন্য উচিত। এর পূর্বে নিজের যৌনক্ষুধাকে আয়ত্তে রাখা দরকার। এর একটি সহজ পদ্ধতি হলো এই– সহবাসের পূর্বে মনকে সহবাস এবং তার স্বাদ ইত্যাদি থেকে একেবারে শূন্য রাখা। স্বভাবগতভাবে নারীদের চাহিদা ভিন্ন হতে পারে। এজন্য স্বামীকে তার স্বভাব, রুচি ও চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে চলতে হবে। যদি কোন সময় নারী তার প্রতি কোন কারণে না ঝুঁকে, তাহলে তাকে এ ব্যাপারে জোর করে বাধ্য করা উচিত নয়।

২. সহবাস এমন সময় হওয়া দরকার, যখন মন সতেজ হবে। অধিক ক্ষুধাও থাকবে না, একবারে পেট ভরাও থাকবে না। ঘুমের আছরও থাকবে না, অধিক পেরেশানিও থাকবে না। মোট কথা, শান্তশিষ্ট মনের মিলন হবে।

৩. সহবাসে জায়গা সাপেক্ষ সতর এবং পর্দা হওয়া উচিত। এজন্য এমন জায়গা নির্বাচন করা উচিত যেখানে অন্য কেউ না থাকে; বরং নির্বোধ বাচ্চারাও না থাকে। (হ্যাঁ, বাচ্চা ঘুমিয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা)। এমন কি অন্য কোনো প্রাণীদেরও উপস্থিতি না হওয়া উচিত। এভাবে কালামে পাক অথবা অন্য কোন দীনি পুস্তকাদি হলেও তাতে কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখা দরকার। সহবাসের সময় একেবারে উলঙ্গ হওয়া ভালো নয়; বরং প্রয়োজনমত সতর খোলা উচিত। অবশিষ্ট অংশ কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা দরকার।

৪. সহবাসের ক্ষেত্রে কিবলামুখি না হওয়া উচিত। কেননা সেটা এহতেরামে কেবলার খেলাফ।

৫. সহবাসের পূর্বে এটাও লক্ষ রাখা দরকার যে, মিসওয়াক অথবা মাজন দ্বারা দাঁত মুখ পরিষ্কার করে নেয়া। মুখ পরিষ্কার করা এমনিতেই একটি সুন্নত এবং বড় গুরুত্বপর্ণ কাজ। কিন্তু এ অবস্থায় সেটা আরও অধিক গুরুত্বের সাথে যত্নশীল হওয়া দরকার, যেন প্রথম অবস্থায়ই একজন অন্যজনের মুখের দুর্গন্ধের কারণে কষ্টের শিকার না হন। বরং কোনো সুগন্ধি বস্তু এলাচি ইত্যাদি মুখে রেখে দিলেই ভালো হয়।

৬. সহবাসের পূর্বে নিম্ন বর্ণিত দুআ পড়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত :

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان
مارزقتنا

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যদি এই সহবাসের মাধ্যমে গর্ভ সঞ্চার হয় তখন এই বাচ্চাকে শয়তানের অনিষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। এই দুআ সতর খোলার আগে পড়া উচিত। যদি সতর খোলার পড়ে স্মরণে আসে তা হলে মনে মনে পড়ে নেওয়া (উচ্চারণ না করে) এবং দুআ দু'জনকেই পড়তে হবে। শয়তানের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার একটি উত্তম মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই বাচ্চার ঈমানের হেফাজত হবে। শয়তান কখনো তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে ঈমান থেকে টলাতে পারবে না। আল্লাহু আকবার! এটা কত বড় দৌলত যে, একটি দুআর বরকতে সন্তানের ঈমানের হেফাজত হয়ে যায়।

৭. সহবাসকালে কথা বলাও ঠিক নয় এবং সে সময় স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে সহবাসের ধ্যান খেয়াল করা বা তা নিয়ে ভাবাও জায়েয নয়। নতুবা সেটাও যিনার সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়ে যাবে। যদি স্বামীর বীর্য দ্রুত বের হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে তাহলে সহবাস শুরুর পূর্বে মনে উপরোল্লিখিত ধ্যান খেয়াল থেকে বেঁচে থাকতে পারলে, দ্রুত বীর্যপাত হওয়া থেকে বাঁচা যাবে। অর্থাৎ সহবাস করার সময় মনে তার খেয়াল আসা যে, সে সহবাস করছে। তা হলে দ্রুত বীর্যপাত হবে না।

৮. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শরীর দেখা জায়েয আছে। তাতে কোন গুনাহ নেই। কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া অকারণ তা দেখা ভাল নয়। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, সারা জীবনে না আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সতর দেখেছি আর না হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সতর দেখেছেন।

৯. সহবাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি আদব হল– যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জনের হাজত পূর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথক না হওয়া। স্ত্রীর হাজত পূর্ণ হওয়ার আগে পৃথক হয়ে যাওয়া সুস্থতার জন্য বড়ই ক্ষতিকর। হাজত পূর্ণ হবার একটি আলামত হলো এই যে, ঐ তেজী ভাব যা সহবাসের অবস্থায় ছিল তা শেষ হয়ে শরীরে এক ধরনের দুর্বলতা বা নিস্তেজতা এসে যাওয়া। সাধারণত যা হয়ে থাকে, অর্থাৎ পুরুষের কামভাব দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং মহিলাদের একটু দেরিতে হয়। এর কারণ হচ্ছে, মহিলাগণ স্বাভাবিকভাবে নরম তবিয়তের হয়। তাদের বিশেষ অঙ্গ লুকায়িত থাকে। এজন্য তাদের বীর্যপাত দেরিতে হয়। পুরুষের তবিয়ত সাধারণত গরম থাকে। এজন্য তাদের অঙ্গ থাকে খোলা। তাই তাদের বীর্যপাত দ্রুত হয়। মোট কথা, যেভাবে পুরুষ কামভাব থেকে অবসর হবে ঠিক সেভাবে নারীকেও তার কামভাব সাধিত না হওয়া পর্যন্ত এমতাবস্থায়ই অটল থাকতে হবে। আর উভয়ের হাজত পূর্ণ হওয়ার আলামত হলো– এরপর দু'জনেরই স্বস্তির সাথে ঘুম এসে যাবে। যদি স্ত্রীর কামভাব পূর্ণ না হয় এবং এমতাবস্থায় স্বামী পৃথক হয়ে যায় তাহলে স্ত্রীর মনে প্রশান্তি আসবে না। মহব্বতের বিপরীতে অশান্তি রিরাজ করবে। যদি সর্বদা এভাবেই চলতে থাকে তাহলে ভয় থাকে, সে তার খাহেশাত (যৌনক্ষুধা) নিবারণের জন্য অন্য কোন পন্থা বা পথ অবলম্বন করতে পারে। এটি অত্যন্ত না পছন্দ ও খারাপ অভ্যাসের কথা, যা লিখতেও মন চায় না। কিন্তু না বলে

বা লিখে পারা যায় না। কেননা, ফ্যাশনবিদরা যা করে থাকেন এজন্য তার মন্দত্বের বর্ণনা জরুরী। সেটা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিশেষ অঙ্গকে চুমু খাওয়া। শরীয়ত বিবেক-বুদ্ধি তথা স্বাভাবিক জ্ঞানী ও ভদ্র মানুষ কখনো এমনটা করতে পারেন না; বরং এমন কথা ভাবতেও পারেন না। এটা পশুত্বের আচরণ। এটা থেকে বাঁচা অত্যন্ত জরুরী।

১০. সহবাস থেকে অবসর হওয়ার পর দু'জনকেই স্বীয় বিশেষ অঙ্গ পৃথক কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করে নেয়া উচিত। বরং হাদীস শরীফে এসেছে– ইস্তেঞ্জা করে (বিশেষ অঙ্গকে ধৌত করে) অযু করে ঘুমাবে। এর দ্বারা পবিত্রতাও হাসিল হলো এবং দ্বিতীয়বার সহবাসের কামভাব সৃষ্টি হবে। যদি অযু না করে তবে কমপক্ষে তায়াম্মুম করবে। তা হলে কিছুটা পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে।

১১. সহবাস থেকে অবসর হওয়ার পর যতক্ষণ শরীর গরম থাকবে, ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু খাওয়া ঠিক নয়। এ সময় ঠাণ্ডা পানিও পান করা শরীরের সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর। তবে স্বাভাবিক বলবান কোন হালকা খাদ্য খাওয়া যেতে পারে।

১২. অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার সহবাস করার ইচ্ছে হবে তখন পূর্ণাঙ্গ কামভাব না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা শরীরের জন্য এবং শরীরের সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর। পূর্ণাঙ্গ যৌনক্ষুধার আলামত হলো– যৌনাঙ্গে স্পর্শ করবে, তবে এর দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্যহীন রাখবে। এতে যদি কামভাব সৃষ্টি হয় তাহলে বুঝবে, এটা প্রকৃত যৌনক্ষুধা; আর না হলে তা নয়।

১৩. সহবাস পুরুষত্বের যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য উদ্দেশ্য নয়। বরং ভালো নিয়তে করবে। যেমন- নফসকে খারাবী তথা মন্দ কাজ থেকে বাঁচানোর জন্য, স্ত্রীর হক আদায়ের জন্য, সুসন্তান পাওয়ার জন্য– যে আল্লাহর পথের আহ্বানকারী হবে ইত্যাদি কাজের নিয়ত করবে। তবেই যৌনক্ষুধা নিবারণের সাথে সাথে সওয়াবও পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে যৌনক্ষুধা নিবারণকে হাদীস শরীফে সদকা পাওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে।

১৪. দ্বিতীয়বার সহবাসের পূর্বেও সহবাসের পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক ক্রিয়া-কলাপের অনুসরণ করবে এবং স্ত্রীকে প্রেম ভালোবাসা তথা আদর সোহাগের মাধ্যমে পূর্ণরূপে তৈরি করবে।

১৫. এ কথা লক্ষ রাখা উচিত, হায়েজ নেফাস অর্থাৎ মহিলাদের নাপাকী অবস্থায় সহবাস করা হারাম। হায়েজের সময়সীমা কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত এবং ঊর্ধ্বসীমা দশ দিন দশ রাত। নেফাসের (গর্ভপাত হওয়ার পর) কম নিসীমা নির্ধারিত নেই। তবে ঊর্ধ্বসীমা চল্লিশ দিন হয়।

১৬. স্বামী-স্ত্রী রাত্রি যাপনের কথাবার্তা স্বীয় বন্ধু-বান্ধব সহপাঠীদের সামনে কখনও আলোচনা করবে না। এটা মারাত্মক গুনাহের কাজ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, অন্যদের সামনে এরূপ কথাবার্তা বলাটা এমন যেন উপর্যুক্ত ঘটনা তার সামনে করা হয়, যা বেহায়া বা নির্লজ্জতার আলামত।

সহবাসের সময়সীমা

একবার সহবাসের পর পুনরায় কখন সহবাস করবে, এ ব্যাপারে কোন সময়সীমা বর্ণিত নেই। মানুষের অবস্থা এবং মেজাযের ভিত্তিতে তার সময়সীমা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। চিকিৎসকগণ লিখেন, এক মাসের মধ্যে একবারই তার জন্য ভালো এবং যদি তা থেকে বেশি চাহিদা হয় তাহলে দু'বার, আর যদি তা থেকেও বেশি হয় তাহলে প্রতি সপ্তাহে একবার। সপ্তাহে একবার সহবাস করার কথা হাদীসের ইশারা দ্বারাও পাওয়া যায়। যেমন- হাদীসে জুমআর রাতে সহবাস করে গোসল করে জুমআর নামায পড়ার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেননা জুমআর নামাযে আসতে যেতে কোথাও যদি দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে মনে কোন প্রকার মন্দ চিন্তা আসবে না। মনের চাহিদা নিবারণের ফলে নামাযে এবং খুতবায় একাগ্রতা আসবে। এরপরও যদি চাহিদা না মিটে তাহলে প্রতি সপ্তাহে দুইবার ইখতিয়ার করবে। বাকী প্রত্যেক রাতে বার বার সহবাস করা শরীরের সুস্থতার জন্য খুবই ক্ষতিকর। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন লোকদের শারীরিক কাঠামো স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল এবং খাদ্যও ভেজালমুক্ত ও পর্যাপ্ত নয়। ফলে বার বার সহবাস করায় মানুষের যৌবন খুবই দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এজন্য যে, একবার সহবাসের দ্বারা যে পরিমাণ বীর্য রের হলো এবং ঐ বীর্য তৈরিতে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন ছিল তা পুনরায় তৈরিতে কতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন– সে জ্ঞান কয়জন রাখে। ফলে অধিক সহবাসের কুফলস্বরূপ খুবই দ্রুত শরীরে প্রভাব ফেলতে শুরু করে এবং মানুষ বিভিন্ন

রোগের শিকার হতে থাকে। যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ হলো দ্রুত বীর্যপাত হওয়া এবং মানুষ যখন থেকেই দ্রুত বীর্যপাতের রোগের শিকার হয় তখন থেকেই সহবাসের স্বাদ ও তার চাহিদা কমতে শুরু করে। আর এতে করে নারীর চাহিদা পূর্ণ না করতে পারার কারণে পরস্পরে মনোমালিন্যতা সৃষ্টি হয়। এমনকি একাধিকবার বীর্যপাতে বীর্য ক্রমশ দুর্বল তথা হালকা পাতলা হতে থাকে– যার প্রভাব সন্তানের উপরও পড়ে। ফলে সন্তান দুর্বল ও কমজোর হয়।

তাছাড়া বার বার সহবাস করার ক্ষতি এটাও যে, স্ত্রী যদি সমান যৌন চাহিদাশীলা না হন তাহলে তার উপর সেটা কষ্টদায়ক মনে হয়। আর এ রকম হওয়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জন্যও ক্ষতিকর। অতঃপর এ থেকে ক্ষতি হলো এই যে, মহিলাগণ জন্মগতভাবে লজ্জাবতী হয়ে থাকে এবং যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য কিছু সময়ের জন্য সে মেনে নেয়। আর একবার শান্ত-শিষ্টভাবে সহবাস করা এক মাসের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু যদি তার চাহিদাকে তোলপাড় করে অতিরিক্ত যৌন চাহিদার দিকে ঠেলে দেয়া হয়, তাহলে তার মনে শুধু সেই খেয়াল ও যৌনচাহিদাই ঘুরপাক খাবে। এমনকি এরপর থেকে সে যৌনক্ষুধা নিবারণে ভূত হয়ে বসবে। আর সেটা তার অভ্যাস হয়ে যাবে। ফল এই দাঁড়াবে যে, কিছুদিন পর আপনি নিজেই অপারগ হয়ে যাবেন। স্ত্রী আপনাকে সহবাসের দিকে টানবে আর আপনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। আপনি শান্তিতে ঘুমাতে চেষ্টা করবেন এবং সে আপনাকে জাগ্রত হওয়ার জন্য বাধ্য করবে। এটা শুধু নিজের কর্মের দিকে দৃষ্টি না করে আয়ত্তহীন হওয়ার ফলাফল। অতঃপর তার দুরবস্থা, পেরেশানীর অন্ত থাকবে না। কেবল ডাক্তার কবিরাজের কাছে আসা যাওয়া ছাড়া কিছুই লাভ হবে না। কিন্তু প্রথম কথার দিকে যদি লক্ষ না থাকে, আরও এগিয়ে চলার চেষ্টা করে, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ারও আশংকা রয়েছে। যদি এভাবেই অন্য কোন মধ্যপন্থা অবলম্বনের সুযোগ মিলে যায়, তবে তারও অবলম্বনকারী হয়ে যেতে পারে। এজন্য অত্যন্ত বুঝে শুনে এই গুপ্ত দৌলত এবং স্বাদ থেকে ফায়দা উঠানো উচিত। তবেই সুস্থতা, শক্তি এবং যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং সন্তান সুস্থ ও সুঠাম হবে।

সহবাসের সঠিক সময়

সহবাসের জন্য দিনের তুলনায় রাত হওয়াই অধিক ভালো এবং ইসলামী চন্দ্র মাস অনুযায়ী প্রথম, পনের ও শেষ তারিখের রাত ছাড়া বাকী প্রত্যেক রাতের যে কোন রাতে করা যেতে পারে। কেননা বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, ঐ তিন রাতে শয়তানরা জমিনের উপর অধিক বিচরণ করে। আর সপ্তাহের অনুপাতে জুমআর রাতের মধ্যে কিছু সংখ্যক ফেকাহাবিদগণ সহবাস মুস্তাহাব লিখেছেন। রাত অনুপাতে রাতের শুরু ভাগ থেকে শেষ ভাগে উপযোগী বলেছেন। রাতের প্রথম ভাগে ঘুমিয়ে পড়বে। তাহলে দিনে ঘুমের অভাবে শারীরিক দুর্বলতা থেকে আরাম পাবে এবং পূর্ণ নীরবতা পাবে। আরও একটি ফায়দা এও যে, রাতের সামান্য কিছু অংশ নাপাকী অবস্থায় অতিবাহিত হবে। আবার এ পরিমাণ বিলম্ব যেন না হয় যে, দ্বিতীয় বার আরামের সুযোগ পাওয়া না যায়। কেননা তারপর কিছুক্ষণ আরাম করে নেওয়া উচিত।

সহবাসের পদ্ধতি

পবিত্র শরীয়তে স্ত্রীর সমস্ত শরীর থেকে যে কোন প্রকারের ফায়দা উঠানোর ইজাযত তথা অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে (لواطت) অর্থাৎ পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করা হারাম। কেননা সেটা সহবাসের জায়গা বা স্থান নয়। এজন্য সহবাস বা মিলন হবে সামনের রাস্তা দিয়ে এবং এ জন্য যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন শরীয়তে এর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে ইশারাতে দুটি পদ্ধতি ভালো বুঝানো হয়েছে। প্রথম পদ্ধতি যা প্রত্যেক প্রাণীর জন্মগত পদ্ধতি। সেটা হল– পুরুষ উপরে এবং নারী নিচে থাকবে। ইঙ্গিতস্বরূপ কুরআনে পাকেও এই পদ্ধতির কথা উল্লেখ আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার, মহিলাদের (ডাক্তারদের মতে) প্রত্যেক মাসে দু'একবার, কারো বেলায় হায়েজের পূর্বে আবার কারো হায়েজের পরে যৌন উত্তেজনা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন তারা সহবাসের জন্য পেরেশান হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা জন্মগতভাবে লাজুক থাকার কারণে মুখের ভাষায় প্রকাশ না করে বরং বিভিন্নভাবে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় পুরুষদের উচিত, এ সময়কে বুঝার চেষ্টা

করা এবং এ সময় তাদের যৌন চাহিদা পূরণ করা। তাতে উভয়ের মধ্যে মহব্বত বাড়বে এবং মনও ভালো থাকবে। এরূপ সময় নষ্ট করে তার যৌন চাহিদা থেমে যাওয়ার পর তাকে কষ্ট দেওয়া বড় লজ্জার ব্যাপার। সুতরাং ইরশাদ করা হয়েছে–

فلما تغشها حملت حملا خفيفا

অর্থাৎ যখন পুরুষ নারীকে ঢেকে ফেলে। তবে তার দ্বারা হালকা গর্ভসঞ্চার হয় এবং তার অবস্থা হচ্ছে এমন যে, মহিলা চিত হয়ে ঘুমাবে এবং পুরুষ উল্টোভাবে মহিলার অঙ্গের বরাবর পুরুষের সকল অঙ্গ এক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

اذا قعد بين شعبها الا ربع ثم جهدها

অর্থাৎ পুরুষ যখন নারীর লজ্জাস্থানের চারপাশে বসে যায়, তখন নারীকে কষ্টে ফেলে দেয়। (شعب اربع) দ্বারা কী বুঝায়? এতে এ কথাই গ্রহণযোগ্য যে, নারীর দু'হাত ও দু'পায়ের মাঝখানে বসা। স্ত্রী যখন চিত হয়ে ঘুমাবে তখন তার পা উঠিয়ে সহবাস করবে। এই পদ্ধতি গর্ভধারণের জন্য অধিক উপযোগী। এমতাবস্থায় মাতৃগর্ভের থলি বাইরের দিকে পুংলিঙ্গের একেবারে সামনে এসে যায়।

সতর্কবাণী : ১. যদি বিয়ে কুমারী কোন মেয়ের সঙ্গে হয় তাহলে প্রথমবার সহবাসের মাধ্যমে তার কুমারিত্বের পর্দা ফেটে যায়। ফলে তার দারুণ কষ্ট হয়। এতে সে মনক্ষুণ্নও হয়ে পড়ে। এ সময় তার সঙ্গে অত্যন্ত নরম ও কোমলভাবে মেলামেশা করা ও নড়াচড়া করা উচিত।

২. কুমারী মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ে হয় এবং কুমারিত্বের পর্দা পাওয়া না যায় তাহলে করণীয় কি? যদি মেয়েটির চরিত্র ভালো হয় এবং খারাপির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ভয় না থাকে তবে শুধু পর্দা না হওয়াতে তাকে অপবাদ দেয়া যাবে না। তার সম্পর্কে খারাপ ধারণাও করা উচিত নয়। এজন্য ফেকাহবিদ ও চিকিৎসকগণ বলেন, কখনও তা অধিক দৌড়াদৌড়ি, আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়া, কোমরে আঘাত– এভাবে অধিক হায়েজ হওয়া এবং পূর্ণাঙ্গ বয়সে বিবাহ না হওয়া ইত্যাদি কারণে কুমারিত্বের পর্দা খতম হয়ে যেতে পারে।

ফরয গোসলের বর্ণনা

পুরুষ যদি রাতে সহবাস করে তাহলে রাত শেষে ভোর হতেই ফজরের নামাযের পূর্বে গোসল করে নেওয়া উচিত। এ গোসলকেই জানাবতের গোসল তথা পবিত্রতার গোসল বলা হয়। জানাবতের গোসল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা উচিত। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর লজ্জা স্থান ভালো করে ধৌত করা। পুরুষ তার অঙ্গকে ভাল করে ধোবে। বিশেষ করে খৎনার জায়গার চামড়ার মধ্যে বীর্য জমে থাকে। তা পরিষ্কার করতে হবে। নতুবা চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এভাবে গোসলের পূর্বে প্রস্রাব করে নিলে ভালো হয়। কারণ যদি বীর্যের কিছু অংশ আটকা থাকে তাহলে সেটা বের হয়ে আসবে। জানাবতের গোসলের পদ্ধতি হলো এই যে, প্রথমে শরীরের ঐ অংশ যেখানে নাপাকী লাগানো আছে তা ধুতে হবে। অতঃপর অযু করবে। তারপর সমস্ত শরীর ভালো করে পানি ঢালবে বা বইয়ে দিবে। গোসলের ফরয ৩টি। যথা- ১. কুলি করা, ২. নাকে পানি দেওয়া এবং ৩. সমস্ত শরীর ভালো করে ধৌত করা।

সতর্কবাণী :

জানাবতের গোসল ছাড়া ঘরে পড়ে থাকা বেবরকতী এবং অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। এক্ষেত্রে লজ্জা-শরমের পরওয়া করা উচিত নয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী– জানাবতের অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে রহমতের ফেরেশতা ঘরে প্রবেশ করেন না। হ্যাঁ, অচেতন্ এবং দুর্বলতার কারণে পড়ে থাকার কথা বলা হলেও নামায যেন কাযা হয়ে না যায়।

স্মরণ থাকা উচিত, যেভাবে সহবাস করার দ্বারা গোসল ফরয হয়, ঠিক সেভাবে স্বপ্নদোষ হলেও গোসল ফরয হয়ে যাবে। এভাবে জাগ্রত অবস্থায় যৌন উত্তেজনার সাথে সাথে যদি বীর্যপাত হয় তবুও গোসল ফরয হবে। আর স্ত্রীকে স্পর্শ করার দ্বারা এবং চুমু দেওয়ার মাধ্যমে এরূপ অবস্থা কমই হয়। তবে সহবাসের সুরতে যখন পুরুষের লিঙ্গের সুপারী সদৃশ জায়গাটুকু স্ত্রীর লজ্জাস্থানে প্রবেশ করিয়ে ফেলে তাহলে তার উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি স্ত্রী অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং লিঙ্গ ভেতরে প্রবেশ ব্যতীত তার বীর্যপাত হয়ে যায় তবুও তার উপর গোসল ফরয হয়ে যাবে।

যিনার বিবরণ

যেভাবে এতক্ষণ পর্যন্ত বিয়ের ফজিলত এবং তার আদব বর্ণনা হলো, তেমনিভাবে বিয়ের বিপরীত অর্থাৎ যিনার ব্যাপারেও কিছু কথা বলা যাক। তাহলে তার মন্দ দিক এবং দোষ-ত্রুটি সহজে বুঝে আসবে। যিনা অর্থাৎ কোন বেগানা নারীর সাথে অবৈধ পদ্ধতিতে যৌনক্ষুধা মিটানো অত্যন্ত খারাপ এবং জঘন্যতম মন্দ কাজ। এটা কবীরা গুনাহ। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে। যিনার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়াতেও বেইজ্জতি ও ধ্বংস হয় এবং বিভিন্ন গজব ও বিপদ-আপদে নিপতিত হয়। যদি ইসলামী হুকুমাত কায়েম থাকে, তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে– অবিবাহিতদেরকে ১০০ বেত্রাঘাত লাগানো এবং বিবাহিতদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে শেষ করে দেয়া। সেটাও সকলের সামনে হওয়া, যেন লোকেরা তা দেখে শিক্ষা নিতে পারে। যেভাবে যিনা করা হারাম, সেভাবে ছেলেদের সাথে কুকর্ম করাও হারাম। এটা যিনা থেকেও আরো অধিক খারাপ এবং ঘৃণিত কাজ। এই খারাপ কর্মের কারণে কওমে লূতকে গজব দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। যার বিবরণ কুরআন পাকে এসেছে। ছেলেদের সাথে ব্যভিচারের শাস্তিও শরীয়তে বিভিন্ন ইমামদের মতে যিনার শাস্তিরই অনুরূপ। কিন্তু উলামায়ে আহনাফ বলেন– সেটা মুসলমান বাদশাহর ইচ্ছা। চায় কোন পাহাড়ের চূড়ায় অথবা কোন উঁচু জায়গার উপর থেকে ফেলে দিয়ে ধ্বংস করে দিবে। অথবা এ থেকেও কঠিন কোন সাজা দিবে। মোট কথা, এই বদকাজের উপর হাদীসে অত্যন্ত কঠিন অভিশাপের বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে হস্তমৈথুন অর্থাৎ হাত অথবা অন্যকোন অনিয়ম পদ্ধতি অবলম্বন করে যৌন চাহিদা মিটানো অত্যন্ত মন্দকাজ। এটা সুস্থতা ও যৌবন ধ্বংস করারও নামান্তর। এজন্য সমস্ত কুকর্ম থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

ওলীমার বর্ণনা

কনে উঠিয়ে আনার পর যখন এক রাত সহবাসের সাথে অতিক্রম হয় তখন ওলীমার দাওয়াত করা সুন্নাত এবং তাতে নিজের সামর্থ অনুযায়ী খরচ করা উচিত। যদি আল্লাহ পাকের দয়ায় সম্পদশালী হও তাহলে নিকট আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধব, সৎ নিষ্ঠাবান লোক, আলেম-উলামাদের এ

সময় দাওয়াত করবে। আর যদি অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয় তাহলে যাই ডাল, রুটি সম্ভব হয় তাতে কিছুলোককে শরীক করে নিবে। কিন্তু ঋণ করে দাওয়াত খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ওলীমা এমনভাবে করেছেন যে দস্তরখানা বিছিয়ে দিয়েছেন। আর সাহাবীদের বলে দিয়েছেন, যার কাছে যা খাদ্য মজুদ আছে তা নিয়ে আস। তারপর সকল খাদ্য মিলিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে খানায় শরীক করে নিলেন। এর থেকে সুন্দর সহজ সরল পথনির্দেশনা ইসলামে আর কী হতে পারে! সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, যেন শুধু আমীর, উজির, আমলা, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের দেখে দাওয়াত না করা হয়। বরং এক্ষেত্রে ধনী-গরীব সকলের সমন্বয় হওয়া চাই।

একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত, যদি কোনভাবে বিয়েতে সামর্থবান না হয় অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ বা স্ত্রীর যৌন চাহিদা মেটানোতে অক্ষম হয়, তাহলে নিজেকে পাপমুক্ত ও নিষ্কলুষ রাখার জন্য শরীয়ত অধিক হারে রোযা রাখার হুকুম দিয়েছে। এর দ্বারা যৌনক্ষুধা কমে যাবে এবং পবিত্রতা অর্জিত হবে।

স্বামী-স্ত্রীর হক

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর হক একজন অন্যজনের নিকট থেকে প্রাপ্য। এজন্য উভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব আদায় করার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। এভাবে হকের দায়ভার আদায় হবে এবং সম্পর্ক মজবুত হবে।

১. একটি গুরুত্বপূর্ণ হক হলো (দু'জনেরই আবশ্যক), একজন অন্যজনের মেজায ও চাহিদার প্রতি পূর্ণ লক্ষ রাখবে। যেমন- কারো যৌন চাহিদা বেশি হয়। এ প্রকারের মেজাযীদের বার বার তার চাহিদা পূরণের তাকিদ হয়। আবার কারো চাহিদা কম হয়। তার যৌন চাহিদার প্রতি ঝুঁক কম থাকে। এখন যদি দু'জনের রুচি ও চাহিদা এক হয়– তবে তো কথা নেই। কিন্তু অনেক সময় এমনও হয়, একজনের চাহিদা অনেক বেশি অন্যজনের কম। যদি পুরুষের চাহিদা বেশি হয় তবে তা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা উচিত এবং স্ত্রীর মেজাযের প্রতি লক্ষ রেখে তা করা উচিত। আর

যদি পুরুষের চাহিদা কম হয় তবে নারীর যৌন চাহিদা পূরণের জন্য তাকে বলবান খাবার গ্রহণ করা উচিত। বলবান খাবারের মধ্যে সবচেয়ে ভালো খাবার হচ্ছে– ছোট প্রাণী ও পাখির গোশত, ডিম, মাছ, চিনাবাদাম, কলিজা, ফলমূল ইত্যাদি। মোট কথা, উভয়ের সমান চাহিদা হলেই জীবন সুখকর হবে।

২. হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় (নাপাক অবস্থায়) স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হারাম এবং নাজায়েয। বরং এ সময়ের মধ্যে নাভী থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত না খোলাই উচিত। এছাড়া অবশিষ্ট শরীর দ্বারা ফায়দা নেওয়া এবং সঙ্গে থেকে রাত্রি যাপন জায়েয। শর্ত হলো, মিলনে জড়িয়ে পড়ার শঙ্কা যেন না থাকে। নাপাকীর সময়ও স্ত্রীদের আদর-সোহাগ কম করবে না। তবে মিলন থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকবে। কারণ, স্ত্রী শুধু যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য অথবা সন্তানাদি পাওয়ার জন্য নয়। বরং একটি প্রাকৃতিক ভালোবাসার বন্ধন। যার দ্বারা সকল মন্দ থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি মনটা আনন্দে ভরে উঠে। যা অন্য কোনভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়।

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক

স্বামী যখন বিয়ে করে নিজ স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসে, তখন তার খেদমত এবং তার হকসমূহের প্রতি লক্ষ রাখা স্ত্রীর জন্য খুবই জরুরী। শরীয়ত দায়িত্বভার মহিলার তিনটি বিষয়ে পুরুষের উপর আবশ্যক করেছে। যার বর্ণনা শরয়ী হকসমূহের আলোচনায় নিম্নে দেয়া হলো।

শরয়ী হকসমূহ

১. খানা-পিনার খরচ।

২. স্ত্রীর কাপড় চোপড়ের খরচ।

৩. বাসস্থান (থাকার জায়গা)।

প্রথমে দুটি হকের মধ্যে স্বামীকে নিজের সামর্থ অনুযায়ী ইন্তেজাম করা জরুরী। সেটা এমন যে, মহিলাকে খাওয়ানো, কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থার ভার পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সে নিজেও যা খাবে স্ত্রীকেও তা

খাওয়াবে। সে নিজে কাপড় পরিধান করবে, স্ত্রীকে পরিধান করাবে। মহিলাকে এই দুটি বস্তুর জন্য উপার্জন করার প্রয়োজন নেই। কারণ, মহিলাকে উপাজর্নের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। এই দুটি হকের ব্যাপারে স্বামীকে স্ত্রীর রুচির প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। শর্ত হলো– শরীয়তের খেলাপ কোন কিছু যেন না হয়। তৃতীয় বস্তু হলো বাসস্থান। তার দায়িত্বও স্বামীর উপর আবশ্যক। যদি বাসস্থানে অনেক বাসিন্দা হয় এবং মা-বাবাও থাকে তাহলে কোন এমন ঘর থাকা চাই যেখানে নির্বিঘ্নে স্ত্রী চলাফেরা করতে পারে। স্বাভাবিক চলাচলে যেন তার কোন কষ্ট না হয় এবং শরীয়তসম্মতভাবে পর্দা রক্ষা করে চলা যায়। নতুবা বেগানাদের সামনে আসতে হবে, যেতে হবে। আর এভাবে শরীয়ত লঙ্ঘন হবে। কমপক্ষে প্রত্যেক ঘরে পুরুষদের ও মহিলাদের জন্য পৃথক কামরার ব্যবস্থা থাকা উচিত। মাসাইল এবং পরস্পরের হক সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানতে বেহেশতী জেওর, হাদিয়াতুন নিছা, তুহকতুল ওয়ালিদ ওয়াল ওলদ ইত্যাদি কিতাবাদি অধ্যয়ন করা উচিত।

চারিত্রিক হকসমূহ

পুরুষকে আল্লাহ তাআলা অনেক বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সাধারণত নারীদের মাঝে এসব বৈশিষ্ট্যের খুব কমই পাওয়া যায়। বীরত্ব-বাহাদুরি সম্মান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা-দর্শন এবং স্থাপত্যবিদ্যায় নেতৃত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য– যা পুরুষের মাঝে পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যায়। এই জন্য পুরুষকে নারীর উপর মর্যাদা ও স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আর এজন্যই স্বামীর কর্তব্য কাজ হচ্ছে, সে নারীর চারিত্রিক অবস্থার দেখভাল করবে। নারীকে যদি ঘরের চাকর-কর্মচারী এবং বেগানা পুরুষের সাথে কোমল ভাব, হাসি-ঠাট্টা এবং কথা বলতে দেখা যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। তাকে এরূপ চলাফেরা কথাবার্তা থেকে বাধা দিবে। প্রথম থেকেই এমন কথাবার্তা থেকে বাধা দিলে চলার পথ সহজ হবে। তা না করে যদি এ অবস্থায় নীরবতা পালন করা হয়, তাহলে পরবর্তীতে কাহিনী বেড়ে যাবে। মহিলার এমন অবস্থা দেখেও যদি পুরুষের উপর এর প্রভাব না পড়ে, তার চোখ মলিন না হয় তবে সেই মানুষ দাইয়ুস। যার ব্যাপারে হাদীসে অভিশম্পাত এসেছে। মহিলাকে কোন অবস্থাতেই স্বাধীন ছেড়ে

দেয়া যাবে না যাতে সে যার সঙ্গে চাইবে তার সঙ্গে কথা বলবে, হাসবে। নারী হলেন অনেক দামী মণি-মুক্তার মত বস্তু। তার হেফাজত করা স্বামীর কর্তব্য কাজ। এভাবে স্বীয় ঘরে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া লোকদের আসা-যাওয়াও কম রাখা উচিত।

নারীর সংশোধনের পদ্ধতি

তবে মহিলাদেরকে সতর্ক করা এবং তার সংশোধনের মর্ম এই নয় যে, যখন ইচ্ছা তখনই পান থেকে চুন খসলেই গর্জে উঠবে। বল প্রয়োগ, মারধর শুরু করে দিবে। এটা ভদ্রতা ও মানবিকতার খেলাপ। তেমনিভাবে স্বাভাবিক বিষয়ের মধ্যে পড়ে না, যেমন কাউকে দেখে ফেলা, কারো ব্যাপারে হেসে ফেলাকে সন্দেহযুক্ত মনে করা। বরং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার অবস্থার প্রতি নজর রাখা উচিত। যদি তার থেকে কোন মন্দ কথা প্রকাশ পায় যার দ্বারা স্বামীর মনে কষ্ট আসে, তখন স্বাভাবিক নারাজি এবং চেহারা বিবর্ণ করে সতর্ক করে দিবে। আর এতেও যদি সতর্ক না হয় তাহলে এক-দু'রাত বিছানা পৃথক করে নিবে। যদি দু'জনেরই অন্তরে পরস্পরের মহব্বত থেকে থাকে তাহলে এতটুকুই যথেষ্ট। কড়াকড়ি গালিগালাজ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি সে তারপরও ভুল পথ থেকে ফিরে না আসে সে ক্ষেত্রে মৃদু মারপিটের অনুমতি আছে। কিন্তু তা যেন চাকর দাসদাসীর মত না হয়। এক হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– কত আশ্চর্যজনক কথা যে, পুরুষ তার স্ত্রীকে দিনে গোলাম বাঁদির ন্যায় মারল এবং রাত্রে তার সঙ্গে সহবাস করল। পরিশেষে এ কথার প্রতিও খেয়াল রাখা জরুরী যে, নারীর পক্ষ থেকে ঘরের কোন কথার উপর অসন্তুষ্টি অথবা নিজের কোন তলবী বস্তু না পাওয়ার উপর রুখে যাওয়া চাহিদাগত বিষয়। বরং সেটা তার প্রেমপূর্ণ ভাবের বহির্প্রকাশ।

সতর্কবাণী : পুরুষকে এতটুকু কথার জরুরী খেয়াল রাখা চাই যে, মহিলার কোন কথার উপর যদি রাগ এসে যায় তবে কাণ্ডজ্ঞানহীন না হয়ে যাওয়া এবং নিজেকে নিজে সামলে রাখা অনেক জরুরী। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– তোমাদের মধ্যে ভালো ঐ ব্যক্তি

যে ঘরবাসীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে এবং আমি তোমাদের সকলের মধ্যে অধিক নিজের ঘরবাসীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহারকারী। এজন্য তাদের মন্দ-চরিত্র এবং গরম মেজাযের উপর ধৈর্য ধারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি অতিরিক্ত রাগ হয় তবে তা থেকে পৃথক হয়ে যাও। اقْرَاء পড়, পানি পান কর। যে অবস্থায় আছ তা থেকে পরিবর্তন হয়ে যাও। স্মরণ রেখ, পলোয়ানদেরকে উত্তেজিত করার মধ্যে বাহাদুরি ও কামালত নেই; বরং বাহাদুরি হলো, রাগের সময় রাগ দমন করে রাখা। চাহিদা এবং জিহ্বা কন্ট্রোলে রাখা। নতুবা যদি খোদা না করুক, রাগের মধ্যে কোন কথা বলে ফেল (অর্থাৎ তালাক দিয়ে দাও) তখন সারাটা জীবন বদলে যাবে। অতঃপর নিজেও আক্ষেপ করবে। রাগের বশীভূত হয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা বুদ্ধিমান এবং বাহাদুরির কাজ নয়। এজন্য যখন রাগের বশবর্তী হবে তখন অত্যন্ত বুঝে শুনে সঠিক বন্ধু-বান্ধবের আত্মীয়-স্বজনের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবে।

১. মহিলাকে বেপর্দা থেকে যতটুকু সম্ভব বাঁচিয়ে রাখবে। গায়রে মাহরম, বেগানা পুরুষদের থেকে সম্পর্ক, মেলামেলা, আসা-যাওয়া ইত্যাদি নিষেধ করবে।

২. স্ত্রী স্বামীর সামনে সর্বদা সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চলবে। তবেই তার দৃষ্টি অন্যের দিকে পড়বে না এবং তার পক্ষ থেকে মনে অন্য কোন ভাব সৃষ্টি হবে না। তার হুকুম শরীয়তও দিয়েছে! যেমনিভাবে যখন স্বামী সফর থেকে আসে, তখন স্ত্রী সৌন্দর্যতা অবলম্বন করবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে আসতেন তখন সাহাবায়ে কেরামের সাথে মদীনার বাইরে অবস্থান করতেন। কেননা তাতে মদীনার মহিলাগণ অবহিত হয়ে যেতেন এবং তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতেন।

৩. স্ত্রীর খাতিরে স্বামীকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং ভালো কাপড় চোপড় পড়া উচিত। তবেই উভয়ের সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হবে।

৪. যদি স্ত্রী ভালো কাপড় এবং অলংকারাদির ব্যাপারে খুবই সৌখিন হয় তাহলে অত্যন্ত হেকমতের সাথে মুত্তাকী আল্লাহওয়ালাদের কাহিনী এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন ও আখেরাতের ফিকর ইত্যাদির কথা তার সামনে বর্ণনা করবে। তবেই সে অনর্থক বস্তু থেকে এবং প্রয়োজন অতিরিক্ত

আসবাবপত্র থেকে তার আগ্রহ কমে যাবে। যদি এভাবে সম্ভব না হয়, তার আগ্রহ থেকেই যায় তবে তার এ সৌখিনতা পুরো ঘরের জন্য ক্ষতিকারক হবে।

৫. নারীর সামনে কাপড় অলংকারাদি ইত্যাদির মধ্যে কোনো বস্তু পড়েছে আর তা দৃষ্টিগোচর হলে তার পূর্ণ তথ্যানুসন্ধান করে নিবে যে, এ বস্তু কোথেকে এসেছে এবং কেন এসেছে? নতুবা নষ্ট হয়ে যাবার পথ এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে।

৬. ব্যবসায়ী লোকদের জন্য উচিত, পুরোপুরি সময় ব্যবসার কাজে ব্যয় না করে; বরং কিছু সময় স্ত্রীর সাথে কাটানো তথা তার মনোরঞ্জনের জন্য কথা বলা, ওঠাবসা, হাসিখুশি ইত্যাদিতে লাগানো উচিত।

৭. স্ত্রী যদি অনুগত এবং নেককার হয় তাহলে কখনও কখনও এক দুটি বাক্যের দ্বারা তার প্রশংসা করা উচিত। তবেই সে আনন্দিত হবে।

৮. স্ত্রীর ইশারা ইঙ্গিতকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। কেননা সে অনেক কথা ভাষা দ্বারা বলবে না। বরং ইশারা ইঙ্গিত তথা চেহারা বিবর্ণ করার মাধ্যমে বুঝা যাবে।

৯. স্ত্রীকে নিজের সন্তানাদির সামনে ভালো মন্দ কিছু না বলা উচিত। নতুবা ঘরের শিষ্টাচার পর্ব নষ্ট হয়ে যাবে এ বাচ্চারা তাদের মার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

১০. স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সর্বোচ্চ প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক রেখে চলা উচিত। বন্যপ্রাণী বাঘ, শৃগালের মত বসবাসের অভ্যাস করো না। ঘরে বা সংসারে সর্বদা হাকিমের রাজত্ব পরিচালনা করো না।

১১. নিজের স্ত্রীর কাছে কখনো অন্য কোনো নারীর প্রশংসা করো না। বিশেষ করে কারো সৌন্দর্যের ব্যাপারে আলোচনা তার মনকে দুর্বল করে দেয় এবং তুমি নিজে তার কাছে সন্দেহের পাত্র বনে যাবে।

১২. ঘরের কাজকর্মে তার মত নাও। তার মত কখনো কোন ব্যাপারে সঠিক কাজে আসতে পারে।

১৩. স্ত্রীর সাথে কোন কথার ব্যাপারে দলিল প্রমাণের জোর চালাবে না। কারণ সে ঐ কাজের উপযুক্ত নয়। হ্যাঁ তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে

বিতর্ক করা যায়, আর সেটাই তার উপযুক্ত।

১৪. মহিলা যদি পড়ালেখা জানে এমন হয় তবে চরিত্র গঠনমূলক ধর্মীয় পুস্তকাদি দাও। উপন্যাস, বিচিত্রা ম্যাগাজিন মন্দ কাব্য ইত্যাদি হাতের নাগালের বাইরে রাখবে।

১৫. কখনো কখনো ঘরে কিছু উলট পালট হয়ে গেলে তা ভেতরেই সামলে রাখ বাইরে তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করো না।

১৬. দুশ্চরিত্রা নারীদের সাথে কখনো ওঠাবসা করতে দিবে না। নতুবা সেও তাতে নষ্ট হয়ে যাবে।

১৭. যদি ঘরের মা-বোনদের সঙ্গে স্ত্রীর মনোমালিন্য হয়, তবে অত্যন্ত দৃঢ় মস্তিষ্কের সাথে দুটো মনের হকের অনুসরণ করে সামলিয়ে নিবে।

১৮. ঘরের মুআমালাতে অত্যন্ত কঠিনও হবে না আবার অত্যন্ত নরমও হবে না।

১৯. খোদা না করুন, যদি কোন বদজবান বদচরিত্রের অধিকারী নারী ভাগ্যে পড়ে যায় এবং সংশোধনের কোন পন্থা না হয় তবে বাধ্য হলে তাকে পৃথক করে দেয়াই ভালো। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত, হাদীসে পাকে পরিস্কার বর্ণিত আছে যে, মহিলা বাম পাঁজরের উপরের পিছলি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সে সবচেয়ে সঠিক বাঁকা জাতি। সুতরাং তার বাঁকা অভ্যাসের সাথে তা থেকে ফায়দা উঠাতে হবে। নতুবা একেবারে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে যাবে। এজন্য পুরুষকে যথাসম্ভব ধৈর্য সহকারে কাজ করতে হবে। যথাসম্ভব তালাক থেকে বাঁচা উচিত। শরীয়ত তালাককে পছন্দ করেনি। তালাককে শরীয়ত (ابغض المباحات) বলেছে। অর্থাৎ মুবাহ জায়েয কাজের মধ্যে মন্দ কাজ। তাই তার উপর পা রাখতে হলে অত্যন্ত বুঝে শুনে রাখা দরকার। আর নিজের বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং যোগ্য বন্ধু-বান্ধব শ্রেণির মতো ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করার পর তা করা উচিত। নিতান্ত বাধ্য হলেই কেবল তা জায়েয। তারপরও এক-দু'য়ের উপর রাখা উচিত। তিন তালাক দেয়া এবং একসাথে তিন তালাক অত্যন্ত মন্দ কাজ। কেননা পরিশেষে অনেক সময় পস্তাতে হয়!

২০. মহিলা যদি অসুস্থ হয় অথবা হায়েজে গড়-বড় হয় তাহলে দ্রুত তার চিকিৎসা সম্পর্কে নজর দিতে হবে।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হকসমূহ

যেভাবে পুরুষের জিম্মায় নারীর অনেক শরয়ী ও আখলাকী হক আছে, তেমনিভাবে নারীর জিম্মায়ও পুরুষের অনেক হক আছে। যা তার কর্তব্য কাজ।

১. মহিলার জিম্মায় স্বামীর সবচেয়ে বড় হক এই যে, যখন তার জিম্মায় নিজের সতীত্ব সোপর্দ করে দিয়েছে তখন তা সর্বদা হেফাজত এবং তার ধারাবাহিকতায় কোন খেয়ানত করবে না। স্বামী উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত থাকুক অর্থাৎ কোথাও সফরে থাক– কোন বেগানা পুরুষের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের খেয়ানত এবং অঙ্গীকার বিচ্যুতি।

২. উল্লেখ্য যে, পুরুষ মহিলাকে বিয়ে করার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভুল পথে জৈবিক চাহিদা পূরণকে ছেড়ে হালাল পথে তা পুরা করার জন্য। এজন্য স্বামীর যখনই চাহিদা হবে তখনই তার সুযোগ দেয়া উচিত এবং তার ধারাবাহিকতায় বিনা কারণে কোন বাহানা না করা উচিত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী– যদি স্বামী তোমাকে স্বীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য ডাকে এবং তুমি রুটি অথবা তাওয়ার কাছেও বসা থাক তখনও তুমি নিজের কাজ ছেড়ে তার চাহিদা পূরণ কর। তার প্রতিও লক্ষ রাখবে, জৈবিক চাহিদা সৃষ্টি হওয়ার কারণে দিনেও সহবাস জায়েয আছে। এতে কোন অসুবিধা নেই। স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অনেক সাহাবী থেকেও অনেক সময় দিনের বেলা সহবাস করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩. স্বামীর যা কিছু মাল সামানা রয়েছে তার হেফাজত করবে। তাকে স্বামীর মর্জির খেলাপ এবং মন্দ পথে খরচ করবে না। এভাবে প্রয়োজনীয় কাজেও অতিরিক্ত খরচ করবে না। বরং প্রয়োজন মেটানোতে অভ্যস্থ হবে।

৪. মহিলাদের উচিত, গৃহকর্ম ভালোভাবে শিখে নেওয়া এবং স্বামীর মেজাযমত খানা, বসবাস, পরিধান, বিছানা সুশৃঙ্খলভাবে করবে।

৫. মহিলাদের স্বামীর কোন কথার উপর এবং তার কাজের উপর বারংবার বাধা প্রদান এবং নিজের কোন কথা রক্ষা না করার জন্য নারাজ হওয়া কোন ভালো কাজ নয়। তাতে মহব্বতে কমতি আসে এবং স্বামী একরোখা মনে করতে পারে। স্ত্রীকে এমন মন্দ আচরণ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৬. স্ত্রীকে স্বামীর উপর অথবা তার কোন কথার উপর রাগান্বিত হওয়া এবং মন্দ কথা, ভালো-মন্দ বলা, গালিগালাজ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার সামিল। স্বামী যদি নিজের সম্মান অথবা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে কিছু না বলে তাহলে তার মর্ম এই নয় যে, তুমি যেভাবে চাইবে চলবে। যদি এরূপ হয়ে পড়ে তোমার অবস্থা তবে স্বামীর মন থেকে তোমার অবস্থান ও মহব্বতও খতম হয়ে যাবে। আর অদ্ভুত কিছু ঘটে যাওয়ার পর আলাদা হয়ে গেলে তোমার চোখের দিকে চাইবে এমন কেউ থাকবে না।

৭. স্ত্রীকে স্বামীর মা-বাবা, ভাই-বোনদের সঙ্গে মধুর সম্পর্কের মধ্যে এবং অত্যন্ত সহমর্মিতা ও মিলমিশের সাথে চলা উচিত। যদিও শ্বশুরালয়ে কিছু কষ্ট হয় তবুও সর্বদা স্বামীর সামনে শ্বশুরালয়ের নালিশ দেওয়া এবং সামান্য কথাবার্তার কারণে স্বামীর কানে শুনানো স্ত্রীর থেকে স্বামীর মহব্বত কমিয়ে দেয়। আর এমনতো হয়েই থাকে যে, এক ঘরে দু'তিনজন মহিলা হলে অথবা দু'চারজন বাচ্চা হলে নিজের খেয়াল খুশিমত সবকিছু হয় না। কিছু না কিছু মেজাযের উল্টো হয়। এজন্য শ্বশুরবাড়ির বড় ছোট সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার রাখবে। তাতে মহব্বত বাড়বে। জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। মহিলাদের উচিত, নিজের সৌন্দর্যতা ও সুস্বাস্থের প্রতি পুরোপুরিভাবে হেফাজত করা। তা নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাতে স্বামীর দৃষ্টি সংযত হবে। অন্যের প্রতি দৃষ্টি পড়বে না।

গর্ভ সম্পর্কিত কয়েকটি কথা

বিয়ের কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই দুটো মনের চাহিদা হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের সন্তান দান করুন। সুতরাং

আসবাবের দরজাতের মধ্যে দু'জনের মিলনের মাধ্যমে সন্তান হওয়া শুরু হয়। কিন্তু অনেক সময় আল্লাহ তাআলা সন্তান দ্রুত দেন না। এতে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা তাঁর ফয়সালাই বড় কথা। এজন্য তার উপর স্বামী-স্ত্রী নিরাশ হতে নেই। হীনমন্যতা ও মনক্ষুণ্নতার কোন কারণ নেই। স্বামী স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হবে না; বরং আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করবে, দুআ করতে থাকবে। প্রয়োজন হলে চিকিৎসা চালিয়ে যাবে। এমনও হতে পারে দু'জনের একজনের সুস্থতার ঘাটতি অথবা শক্তির কমতি থাকতে পারে। যখন চিকিৎসা হবে তখন আশা করা যায় দেরিতে হলেও সন্তান হবে। আর এ দেরিতে হওয়ার মধ্যেও আল্লাহ তাআলার কোনো হেকমত নিহিত থাকতে পারে। যদি পূর্ণ দিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং চিকিৎসার পুরোপুরি কাজ অতিক্রম হওয়ার পর মহিলার এমন কোন দুর্বলতা বা রোগ প্রকাশ পায় যাতে সে সন্তান নিতে পারবে না এবং স্বামী সন্তানের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায় তবে শরীয়তে তার জন্য ইজাযত আছে। কিন্তু দু'স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। যদি হক আদায়ের বেলায় কমতি হয় তবে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত খারাপ। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যদি কারও দু'জন স্ত্রী হয় এবং সে তাদের কোন একজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে, তবে কেয়ামতের দিন তার শরীর ঝুঁকানো থাকবে। লোকেরা তাকে ঝুঁকানো দেখে বুঝে ফেলবে যে, সে গুনাহগার এবং স্ত্রীদের ব্যাপারে ইনসাফ করেনি। এজন্য কয়েক স্ত্রী হলে সকলের ব্যাপারে সমান দৃষ্টি রাখা জরুরী।

এরপর যখন আল্লাহ তাআলা সন্তান দান করবেন তখন তার প্রথম সিঁড়ি গর্ভ থেকে শুরু হয়। গর্ভ হওয়ার বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পায়। যার গুরুত্বপূর্ণ আলামত মাসিক (ঋতুস্রাব) বন্ধ হওয়া এবং কোন কোন সময় বমির ভাব, বমি হওয়া ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মহিলার নিজ স্বাস্থের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখা উচিত এবং বিশেষভাবে শক্তি ও সাহসের প্রতি বিভিন্ন রোগের জন্য কোন চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে ওষুধ সেবন করা উচিত। মহিলাদের ঐ দিনগুলোতে বমিভাব, বমি, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদির অভিযোগ থেকেই থাকে। এজন্য জায়গা বেজায়গা টক এবং লবণাক্ত বস্তু খাওয়ার আগ্রহ বাড়ে। কোন কোন মহিলার কালি মাটি খাওয়ার আগ্রহ হয়। এমতাবস্থায় তার লক্ষ রাখা উচিত, যে বস্তুগুলো

সুস্থতার জন্য উপকারী হবে সেগুলো খাবে। স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর এমন বস্তু পরিহার করবে। এমনিভাবে গর্ভাবস্থায় সহবাসে কষ্ট দেয়া, দৌড়ানো, আছাড় খাওয়া এবং ভারী বস্তু বহন থেকে বেঁচে থাকবে। নতুবা ভয় আছে, গর্ভপাত হয়ে রক্ত যাওয়া শুরু হয়ে যেতে পারে। মহিলার এটাও উচিত যে, গর্ভাবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস, শান্তশিষ্ট ও চিন্তামুক্ত থাকা প্রয়োজন। নিজের কাপড় ও শরীর পরিষ্কারের সাথে সাথে মনকে পাক পবিত্র রাখতে হবে। এজন্য যে, তার আছর কুদরতিভাবে তার পেটের ভেতরের বাচ্চার উপর পড়ে। তাই ঐ দিনগুলোতে বাচ্চার মাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের পবিত্রতা এবং ভদ্রতার সাথে থাকতে হবে। গর্ভাবস্থায় সহবাস তথা মিলন থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা উচিত। বিশেষ করে প্রথম চার মাস এবং সাত মাসের পর। কেননা গর্ভের কোন ক্ষতি যেন না হয়। অবশ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েয। মহিলাকে গর্ভাবস্থায় চূড়ান্ত কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তারপর এ সময় তো কম নয়। বরং নয় মাস পর্যন্ত কাটাতে হয়। তারপর সবচেয়ে বড় কষ্ট হলো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়। সুতরাং কুরআনে কারিমে মার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে সেই কষ্টের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– অর্থাৎ তার মা তাকে নিজের পেটে উদরে রেখেছেন। দুর্বলতার পর দুর্বলতা সহ্য করেছেন।

حملت امة وهنا على وهن

অন্য এক জায়গায় বলেন–

حملته امة كرها ووضعته كرها

অর্থাৎ তার মা নিজের পেটে তাকে ধারণ করেছেন অত্যন্ত কষ্ট করে। আর ভূমিষ্ঠ করেছেন অত্যন্ত কষ্টের সাথে। সুতরাং এই কষ্ট একটা বাচ্চার জন্য। আর সেই বাচ্চা আল্লাহর একজন মুমিন বান্দা হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের মধ্যে পরিগণিত হবে। দীনদার হবে, সত্যপথের পথিক হবে। এজন্য হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান গর্ভধারণ থেকে দুধপানের সময়কাল পর্যন্ত মায়ের বেশুমার সওয়াবের কথা বর্ণনা করেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– যেসব মহিলা গর্ভপাতের সময় মারা যায় তাকে

শহীদ বলা হয়। তাই নারীদেরকে গর্ভধারণ এবং প্রসবের সময়ের কষ্টকে হাসি খুশির সাথে সহ্য করা উচিত। এটা শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্র নয়; বরং তা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যায় এক সন্তান হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার পূর্বেই আবারও গর্ভসঞ্চার হয়ে যায়। এখনও প্রথম বাচ্চাই দুধ পান করে। আবার মহিলাও খুব দুর্বল। এক্ষেত্রে ভালো হয়, আরেকটি বাচ্চা তাড়াতাড়ি না নেয়া; বরং কিছুদিন বিলম্ব করা। এমতাবস্থায় শরীয়ত কয়েকটি অবস্থা জায়েয রেখেছে। যাতে করে পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষতি না হয়। তার মধ্যে একটি হলো আজল। অর্থাৎ (সাময়িক জন্মবিরতি) স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সময় যখন বীর্যপাত হবে তখন তা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। এতে করে বীর্য বাইরে বেরিয়ে আসবে। এতে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়। এমনিভাবে একজন হাকিম সাহেব একটি পদ্ধতি লিখেছেন যে, মহিলারা সহবাসের পর যদি দ্রুত চিত হয়ে পড়েন অথবা দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করেন তাহলেও গর্ভসঞ্চার হবে না। শুধুমাত্র ঐ পদ্ধতিগুলোই শরীয়ত অনুমোদন করেছে, যাতে কিছুকাল গর্ভসঞ্চার থেকে বিরত রাখা হয় এবং নারী-পুরুষ কারো কোন ক্ষতি না হয়। আজকাল যেভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে সেটা সব সময়ের জন্য সন্তান নেয়ার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। যা আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত একটি শক্তিকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়ারই নামান্তর। এর মাধ্যমে সর্বদা সন্ত ান নেয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কারো জন্য তা অত্যন্ত ক্ষতিকরও হয়ে দাঁড়ায়। এর মাধ্যমে তার সামনের দিনগুলো কষ্টকর হয়ে থাকে। কেননা এসব করতে গিয়ে অনেক পাওয়ারী ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হয়, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শারীরিক সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর।

প্রসবকালীন অবস্থার বিবরণ

যখন বাচো জন্ম হবার সময় নিকটবর্তী হয় তখন উচিত হলো, ঘরে থেকেই ভালো দক্ষ একজন ধাত্রী ডেকে নিয়ে আসবে। তাহলেই জন্মের সময় অন্যান্য বস্তুর সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে। তার সাথে সাথে ডাক্তারী অথবা হাকিমী পরামর্শ এবং চিকিৎসা ইত্যাদিও চালিয়ে যাওয়া ভালো। বর্তমান যুগে এটা একটা প্রথা হয়ে গেছে যে, প্রসবকালীন সময়ে স্ত্রীকে

হাসপাতালে সোপর্দ করে দেয়া হয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সেখানে অমুসলিম ধাত্রী থাকতে পারে এবং এক্ষেত্রে বেপর্দাও হয়ে থাকে। এমনকি পুরোপুরি অনৈসলামিক পরিবেশও থাকতে পারে। এজন্য এমন সময় ঘরের পবিত্র অবস্থা ছেড়ে যেখানে সেখানে যাওয়া ভালো কাজ নয়। হ্যাঁ, যদি ইচ্ছের বাইরে বাধ্য হয়ে যেতেই হয়, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। বাচ্চার জন্মের পর কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী।

১. বাচ্চার জন্মের পর পাকসাফ করে এবং গোসল দিয়ে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে তাকবীর বলা উচিত।

২. যদি আশপাশে কোন বুযুর্গ অথবা নেককার পুরুষ থাকেন তাহলে তার কাছ থেকে তাহনীক করানো অর্থাৎ কোন বুযুর্গের হাতে খেজুর চিবিয়ে নরম করে বাচ্চার তালুতে লাগিয়ে দিবে। তাতে সর্বপ্রথম বাচ্চার পেটে নেককার একজন মানুষের লব এবং খেজুরের মিষ্টতা পৌঁছবে যাতে বরকত হবে।

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা

যখন বাচ্চা বুঝদার হতে থাকে তখন প্রথমে তাকে আল্লাহর নাম এবং পবিত্র কালিমা শেখানোর চেষ্টা করতে হবে। যখন বুঝদার হয় তখন অধিক হারে দীনি শিক্ষার চর্চা শুরু করবে। তার সামনে কোন মন্দ কথা বা মন্দ কার্যকলাপ করবে না এবং যদি তার থেকে কোন খারাপ আচরণ প্রকাশ পায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। হালাল রুজির পুরোপুরি গুরুত্ব দিতে হবে। মাতা-পিতার পরিশুদ্ধতা ও কামিয়াবীর জন্য দুআ করতে হবে। মোট কথা, তার শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণ তত্ত্বাবধান করতে হবে। কখনো অমনযোগী হলে চলবে না।

মার কোল তার প্রথম প্রতিষ্ঠান যা বলার অপেক্ষা রাখে না। মার শিক্ষাই সন্তানের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণকামিতার চাবিকাঠি। পরিবার পরিজনের মনের শিক্ষা-দীক্ষার সহজ পদ্ধতি আজকাল এই যে, ঘরে রেডিও টেলিভিশনের পরিবর্তে দীনি কিতাবাদির শিক্ষা অত্যন্ত পাবন্দির সাথে করা উচিত। কখনো পরস্পরে মাসাইল আলোচনা করা। কখনো বিভিন্ন সময় ও অবস্থার দুআর কালাম শিক্ষার চর্চা করানো যায়। কোন

কোন সময় গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত ও তাসবীহাতে মশগুল থাকবে। তবে তো নিজের ঘরই এক প্রকার মাদ্রাসা অথবা খানকাহ হয়ে যায়। আর ঘরবাসী ইনশাআল্লাহ সহীহ পথের উপর চলার উপযোগী হয়ে যায়।

সন্তানের নিকট মাতা-পিতার হকসমূহ

যখন সন্তান বুঝদার হয়ে যায়, তখন তাদের এই কথা অত্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত যে, তাদের নিকট মাতা-পিতার অনেক হক আছে। বাল্যকালে চূড়ান্ত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে অত্যন্ত মুহাব্বত করে মা তাদের লালন পালন করেছেন। মা দুর্বল হলেও সন্তানের জন্য সর্বাধিক কষ্ট তাকেই সহ্য করতে হয়েছে (যা কুরআনও বর্ণনা করেছে)। এজন্য মায়ের হকের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব আরো বেশি হয়ে যায়। তাই সন্তানের পিতা-মাতার অনুসরণ এবং বাধ্যগত হওয়া জরুরী। মাতা-পিতার অবাধ্যতাকে সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে গণ্য করা হয়। এক হাদীসে কুফর ও শিরকের পর সবেচেয়ে বড় গুনাহ মাতা-পিতার অবাধ্যতাকেই বলা হয়েছে। মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে রিযিকে বরকত ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত হয়। তাছাড়া তাদের সন্তুষ্টিতে বেহেশতে প্রবেশ করারও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। মাতা-পিতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান পৃথিবীতে কতটুকু বঞ্চিত অকৃতকার্য হয় এবং আখেরাতে তার কী ভয়াবহ অবস্থা হবে তার দু'একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

বনি ইসরাইলের তিন লোকের কাহিনী

বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারা বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ এই গর্তের উপর থেকে পাথরের এক বিরাট চাকা গড়িয়ে এসে গর্তের মুখে পড়ে গেল। ফলে গর্তের মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আর এখান থেকে বের হবার কোন রাস্তা থাকল না। তাদের বিশ্বাস হয়ে গেল, এখন মৃত্যু অবধারিত। ঐ তিনজন পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করল যে, প্রত্যেকজন নিজ নিজ কোন মকবুল আমলের জরিয়া করে দুআ করবে।

হতে পারে এর মাধ্যমে নাজাত মিলে যেতে পারে। সুতরাং তাদের একজন (যা বলা এখানে উদ্দেশ্য) এই দুআ পড়ল– হে আল্লাহ! তুমি জান আমি প্রত্যেহ বকরি চড়াই। বিকেলে ফিরে এসে প্রথমে নিজের মাতা-পিতাকে দুধ দোহন করে পান করাই। তার পর সন্তানদেরকে। একদিন আসতে দেরি হয়ে গেল। ঘরে যখন প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম মাতা-পিতা শুয়ে পড়েছেন। দুধ দোহন করলাম। এ সময় আমার বাচ্চা আমার কাছে দুধ চাইল। কিন্তু আমি বললাম, আমার বাবা-মা যতক্ষণ দুধ পান না করবেন, তোমাদের দেব না। কিন্তু তাদের জাগ্রত করা উচিত নয়। দুধ পাত্রে নিয়ে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম– যখন জাগ্রত হবেন তখন পান করাব। এদিকে বাচ্চারা দুধ চেয়েই চলেছে। এমতাবস্থায় ভোর হয়ে গেল। তারপর মা-বাবা ঘুম থেকে উঠলেন। তাদের দুধ পান করালাম অতঃপর সন্তানদের দিলাম। হে আল্লাহ! এই আমলের উসিলা নিয়ে দুআ করছি যে, রাস্তা করে দাও।

এই দুআর পর সত্যি সত্যিই সে পাথর কিছুটা সরে গেল। ফলে বাইরে থেকে কিছু বাতাস আসতে লাগল এবং আলোকিত হল গুহা। এভাবে অন্যরাও দুআ করলে গর্তের মুখ থেকে সে পাথর একেবারে সরে গেল এবং তারা রাস্তা পেয়ে গেল।

হযরত মুসা (আ.)-এর জান্নাতের সাথী

হযরত মুসা (আ.) দুআ করলেন– হে আল্লাহ! জান্নাতে কে আমার সাথী হবে তা বলে দাও। আল্লাহ তাকে বলে দিলেন, অমুক জায়গায় এই গুণবিশিষ্ট লোক থাকে, তাকে দেখে নাও। সুতরাং সন্ধান করতে করতে তিনি পৌঁছলেন সে ব্যক্তির নিকট যিনি জান্নাতে হযরত মুসা (আ.)-এর সাথী হবেন। তিনি দেখলেন সেই লোককে। তার মা একেবারে বুড়ো। চলাফেরা করতে পারে না। এই লোক মেহনত পরিশ্রম করে এবং প্রতিদিন দু'বেলা এসে নিজের মাকে নিজ হাত দ্বারা খাদ্যের লোকমা মুখে উঠিয়ে দেয়। মায়ের সব ধরনের খেদমত করে। তার 'মা' তার বিনিময়ে তাকে দুআ দেন– বাবা! আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে মুসা (আ.)-এর বন্ধু ও সাথী করে দিন।

মৃত্যুকালে কালিমা নসীব না হওয়া

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামানায় এক যুবকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। এ সময় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনলেন এবং কালিমার তালকীন করাতে লাগলেন। কিন্তু কালিমা তার জবান দ্বারা বের হচ্ছিল না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝে ফেললেন যে, মা তার প্রতি নারাজ। অতঃপর তার মাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কি চাও তোমার ছেলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলুক! তার মা বলল– না। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ছেলে ভুল করেছে, মাফ করে দাও।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথা শোনে তার মা তাকে মাফ করে দিলেন। তারপর তার ছেলের মুখে কালিমা জারি হল। অতঃপর সে ব্যক্তি ইন্তেকাল করল। এবার ভেবে দেখুন, মায়ের অন্তুষ্টির জন্য কত বড় মসিবত নেমে আসে।

একজন দীনদার নারীই পারে একটা পরিবারকে বদলে দিতে

গ্রামের এক সাধারণ পরিবারের মেয়ে। নাম তার লিজা। সে মহিলা মাদরাসায় লেখাপড়া করতো। অত্যন্ত মেধাবী ও খোদাভীরু ছিল। নামায রোযাসহ সকল ইবাদত-বন্দেগীর সে খুবই পাবন্দ ছিল। কিন্তু বাবা তার নামায পড়তো না। একটু উগ্র টাইপের ছিল। মেয়ে লিজা তখন অত্যন্ত চিন্তিত যে, বাবাকে কেমন করে নামায পড়ানো যায়!

একদিন রমযান শুরু হওয়ার পর সে ইচ্ছে করলো, বাবা যখন সেহরী খাওয়ার জন্য উঠবে, তখন সেহরী খাওয়ার পর বাবাকে ওযু করার জন্য একটু পানি গরম করে দেব। সে তার ইচ্ছে অনুযায়ী শীতের দিনে সেহরীর সময় উঠে পানি গরম করে বাবার কাছে হাজির হল এবং বললো,

আব্বু! পুরো দিন উপবাস থেকে রোযা রাখার মাধ্যমে একটি ফরয আদায় হয়, আর ওয়াক্ত নামাযে রয়েছে পাঁচটি ফরয। আব্বু! একটি ফরয আদায় করতে সারাটা দিন কষ্ট করতে হয়। আর এক ওয়াক্ত নামায পড়তে দশ মিনিট সময় লাগে না। অথচ অহরহ ঐ নামাযগুলো কাযা করছেন– যা অত্যন্ত দুঃখজনক। নামায তরককারী জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, আর তাতে আমার আব্বাও জ্বলবে– সেটা আমি মানতে পারি না। আব্বু! আমি পানি গরম করে নিয়ে এসেছি, ওযু করে নামাযটা পড়ে নিন।

কিন্তু নাছোড়বান্দা নামায পড়বেই না। এদিকে লিজাও বাবার পেছন ছাড়ছে না। এভাবে সে দীর্ঘদিন বাবার পেছনে মেহনত করার ফলশ্রুতিতে ঐ বাবা হঠাৎ একদিন লজ্জায় কাতর হয়ে মেয়েকে বলতে লাগলেন, মা! আজ থেকে আর কোন দিন নামায কাযা করবো না। পরন্তু ঐ বাবা চিরদিনের জন্য নামাযী হয়ে গেল।

ঐ মেয়ে যখন উপযুক্ত হলো তখন তার বিয়ে হল একটা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত পরিবারে। স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি কেউই নামায পড়ে না। বিয়ের পর থেকে ভাগ্যিস মেয়েটি তার জীবনসঙ্গী স্বামীর পেছনে শ্রম দিতে শুরু করলো। একদিন তার স্বামীও নামাযী হল, এমনকি গোটা ফ্যামেলির সকলেই নামাযী দীনদার হয়ে গেল। তাই তো বলা হয়েছে, একজন দীনদার নারীই পারে সমাজ ও পরিবারকে বদলে দিতে। সমাজের প্রত্যেকটি মেয়েই লিজার মত আদর্শ ও দীনদার হয়ে উঠুক আমরা তাই কামনা করি।

স মা প্ত

9 847016 800252

বইঘর

[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৮১৭০৮৭৬৩৪